যে..

পাপ..

আপনার ঈমান ও আমলকে নিস্ক্রীয় করে দেয়



উৎসর্গঃ

এ বইসহ আমার জীবনের সকল কর্ম (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী মুসলিম ভাইবোনদের হেদায়াত ও মাগফিরাতের জন্য) মহান প্রভু আল্লাহর নামে উৎসর্গকৃত।

স্বত্বঃ

এ বইসহ আমার সকল বইয়ের স্বত্ব ফী সাবীলিল্লাহ, তাই দ্বীন ও উম্মাহর স্বার্থে যেকেউ এসব বই প্রকাশ, প্রচার, বিক্রি ও বিতরণ করতে পারবেন।

রচনায়ঃ

মুফতী শরীফ মহাম্মদ সাঈদ

মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক ও গবেষক

ভূমিকা

আমাদের এ জীবন ক্ষনস্থায়ী আর মৃত্যুর পর যে জীবন শুরু হবে (অর্থাৎ আখেরাতের জীবন) ওটা হল আমাদের চিরস্থায়ী জীবন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য। আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্র হল দুনিয়া। দুনিয়ার জীবনে মহান আল্লাহকে খুশী করে চিরস্থায়ী জীবনে অনন্ত সুখ লাভ করাই আমাদের এ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আর এ লক্ষ্য অর্জনে সফতার উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা মুসলিম হয়েছি।

মহান আল্লাহ আমাদের জন্য তার ইবাদাতের যে পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এর নাম ইসয়াম, মানে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্থনের পথ, "ইসলাম" মানেই আত্মসমর্পণ।

আল্লাহ যেহেতু অন্তর্জামি। তাই আল্লাহকে খুশী করতে হলে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে। ভন্ড মুসলিম বা প্রতারক মুসলিম হয়ে আল্লাহকে খুশী করা যাবে না। আর আসল মুসলিম হতে হলে বাস্তব জীবনের ৩টি ধাপে ইসলামকে মেনে নিতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। যথা..

- অন্তরে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে
- ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান ও বিষয়াদিকে নীতিগতভাবে মেনে নিতে হবে
- বাস্তব জীবনে এ বিশ্বাস ও নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটিয়ে সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে।

অর্থাৎ ভালো মুসলিম তথা মুঅমিন হতে হবে, ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে আর নিজের ঈমানকে বিনষ্ট হওয়া থেকে বাচিয়ে রাখতে হবে। একজন মুঅমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তার ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখা। অর্থাৎ এমন কিছু না করা যাতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা একেবারেই উদাসীন। আমরা অযু ভঙ্গের কারণ মুখস্ত করি, নামায ভঙ্গের কারণ মুখস্ত করি, রোজা ভঙ্গের কারণ জানি, কিন্তু ঈমান ভঙ্গের কারণ জানি না। অথচ এটা হল জীবনের সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ন বিষয়সমূহের মাঝে অন্যতম। বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলাকে বলা হয় আ'মাল বা সতকাজ আর বিশ্বাসগত, নীতিগত বা কাজে-কর্মে আল্লাহর কোনো বিধানের বিপরীতে কিছু করাকে বলা হয় পাপ।

পাপ একটি প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়। পাপ আমাদের ঈমান, আমল ও স্বভাব-চরিত্রকে সরাসরি প্রভাবিত করে। কিছু পাপ ঈমানকে নস্যাত ও অকেজু করে দেয় আর কিছু পাপ ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে। তাই পাপ ও পাপাচার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। আর এ আবশ্যকতার কথা বিবেচনা করেই আমরা এ অনুচ্ছেদটি রচনা করেছি। সহজভাবে বুঝার জন্য এ অধ্যায়কে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যেমন..

১ম অধ্যায়ঃ পাপ, পাপের প্রতিক্রিয়া, পাপের উৎস ও পাপমোচনের উপায়

২য় অধ্যায়ঃ কুফর

৩য় অধ্যায়ঃ শিরক

৪র্থ অধ্যায়ঃ নিফাক্ব বা মুনাফিকী

৫ম অধ্যায়ঃ ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপের কিছু নমুনা

১ম অধ্যায়ঃ পাপ, পাপের প্রতিক্রিয়া, পাপের উৎস, তাওবাহ ও ইস্তিগফার

পাপ, পাপের প্রতিক্রিয়া, পাপের উৎস, পাপ মোচনের উপায়, তাওবাহ, ইস্তিগফার, ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের জীবনের সাথে অতঃপুত ভাবে জড়িত খুবই গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই এসব বিষয় সঠিকভাবে জানা এবং সঠিকভাবে বুঝা অপরিহার্য। আর এ বিষয়ে আপনাদেরকে সহযোগিতা করতেই আমাদের এ বই। সহজভাবে বুঝার জন্য অধ্যায়কে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যেমন..

অনুচ্ছেদঃ ১. পাপ পরিচিতি
অনুচ্ছেদঃ ২. পাপ মোচনের উপায়
অনুচ্ছেদঃ ৩. পাপের প্রতিক্রিয়া
অনুচ্ছেদঃ ৪. পাপের উৎস
অনুচ্ছেদঃ ৫. ঈমান বিনষ্টকারী পাপসমূহ

অনুচ্ছেদঃ ১. পাপ পরিচিতি ও পাপের প্রকারভেদ

আইন ও বিধান মেনে চলার নাম ভালোকাজ আর আইন ও বিধান ভঙ্গ করার নাম অপরাধ। সামাজিকভাবে যা অপরাধ; ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে একেই মানুষ পাপ বলে থাকে। ইসলামী পরিভাষায়; জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে (নৈতিক, আদর্শিক, বিশ্বাসগত অথবা কার্যকরীভাবে) ইসলামী রীতিনীতি ও বিরোধী কিছু করা, আল্লাহর বিধান অমান্য করা বা আল্লাহর আইন ভঙ্গ করা অপরাধ, আর আমাদের সমাজে এ অপরাধই পাপ হিসেবে পরিচিত।

পাপের ধরনঃ পাপ সাধারনত ৪ ধরনের হয়ে থাকে। যথা..

(১) বিশ্বাসগত পাপ,
(২) নৈতিক ও আদর্শিক পাপ
(৩) কার্যকরী পাপ বা কর্মগত পাপ,
(৪) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পাপ।

বিশ্বাসগত পাপঃ আল্লাহ থেকে আগত কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা বা সন্দেহ করা অথবা এর বিপরীতে কোনোকিছু বিশ্বাস করা হচ্ছে বিস্বাসগত পাপ।

বিধানঃ ইসলামী রীতি অনুযায়ী বিশ্বাস হচ্ছে ঈমানের অংশ, তাই বিশ্বাসগত সকল পাপই কুফর বা শিরকের অন্তর্গত। এমন পাপ ঈমানকে বিনষ্ট করে ফেলে এবং আ'মাল ও ইবাদাতকে নিস্ফল ও বরবাদ করে দেয়। এমন পাপে জড়িত ব্যক্তি মুঅমিন থাকতে পারে না, বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।

নৈতিক ও আদর্শিক পাপঃ আল্লাহ থেকে আগত দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে অমান্য, অবজ্ঞা, অবহেলা বা তুচ্ছ করা অথবা এর বিপরীত কোনোকিছুকে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া নৈতিক ও আদর্শিক পাপ।

বিধানঃ ইসলামী রীতি অনুযায়ী নীতি আদর্শ ঈমানের অংশ, তাই নৈতিক ও আদর্শিক সকল পাপই কুফর বা শিরকের অন্তর্গত। এমন পাপ ঈমানকে বিনষ্ট করে সকল আ'মাল ও ইবাদাতকে নস্যাত করে দেয়। এমন পাপে জড়িত ব্যক্তিও মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।

বিঃ দ্রঃ = আল্লাহ থেকে আগত তথ্য বা বিধান আমরা দুইভাবে পেয়ে থাকি.. সরাসরি আল্লাহর কিতাব থেকে অথবা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে। তবে যেহেতু আমরা নবীর কথা সরাসরি শুনি নাই। তাই বর্ননাকারীর নির্ভরযোগ্যতা, বর্ননার ধারাবাহিকতাসহ নানা কারনে নবী সা. থেকে আগত সকল হাদীছ সমানভাবে মানা হয় না। নবীর হাদীছ হিসেবে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায় শুধু মুতাওয়াতির মানের হাদীছের উপর। তাই শুধু ওই মানের হাদীছ থেকেই নীতি, আদর্শ, আক্বীদাহ এবং ফরজ বা হারামের বিধান নির্ধারন করা যায়। আর অন্য মানের হাদীছ সাহীহ হলেও এর দ্বারা নীতি, আদর্শ, আক্বীদাহ এবং বিধানগতভাবে ফরজ বা হারাম নির্ধারন করা হয় না, বরং শুধু বিধানগতভাবে সুন্নাহ ও মাকরুহ বিধান নির্নয় করা হয়।

কর্মগত পাপঃ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে (নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার পর) কার্যকরীভাবে পালন না করা অথবা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো হারাম কাজে জড়িয়ে পড়া; ইত্যাদি হল কর্মগত পাপ।

বিধানঃ কর্মগত পাপ সাধারনত কবীরাহ তথা মহাপাপ হয়ে থাকে। তবে অবস্থা ভেদে কুফর শিরকও হতে পারে।

বিঃ দ্রঃ= কুফর শিরক ব্যতীত অন্য কবীরাহ গোনাহ করলে মানুষ ফাসিক হয়। ফাসিক ব্যক্তি ঈমান হারা হয় না, তাই চির জাহান্নামী হয় না। ফাসিক ব্যক্তি মেয়াদী সাজা ভোগ করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। আর সকল ফাসিককে জাহান্নামে যেতেও হবে না। নবী রাসূল ও নেক লোকদের শাফায়াতে অনেক ফাসিকই মাফ পেয়ে যাবে। আর কুফর ও শিরক হল ঈমান বিনষ্টকয়ারী মহাপাপ। তাই কোনো প্রকার কুফর বা শিরিকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। আর যে মুসলিম এমন পাপে জড়িয়ে পড়ল তাকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিক আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত থেকে চির তরে বঞ্চিত হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। তাই মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পাপঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে খুশী করতে বা অন্য থেকে প্রতিদান পেতে আ'মাল ও ইবাদাত করলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পাপ হয়। ইসলামের পরিভাষায় এমন পাপকে বলা হয় "রিয়া"। রিয়া আ'মাল ও ইবাদাতের ফলকে নস্যাত করে দেয়।

পাপের প্রকারভেদঃ পাপ সাধারণত দুই প্রকার; কাবীরাহ ও ছাগী'রাহ তথা মহাপাপ ও সাধারণ পাপ। যেমন..

- আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কোনো তথ্যে বিশ্বাস না করা, অথবা এমন কোনো বিষয়কে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা অথবা এমন কোনো তথ্য গোপন করা অথবা যাদু করা অথবা আল্লাহ, রাসূল বা কোনো ফিরিস্তাকে গালি দেওয়া, ইত্যাদি হচ্ছে মহা-পাপ।এমন পাপকে কুফর বলা হয়।
- আল্লাহ জাতিসত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্যকিছুকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক মনে করা অথবা আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্যেকে সম্মান দেখাতে বা শ্রদ্ধা জানাতে এমনকিছু করা, ইত্যাদি হচ্ছে আরেকটি মহাপাপ, এর নাম শিরক। কুফর ও শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ।
- উল্লেখিত দলীল দ্বারা প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত কোনো হারামে জড়িয়ে পড়া অথবা কোনো ফরজ তরক করা তথা আল্লাহর কোনো আদেশ লঙ্ঘন করা অথবা আল্লাহ সরাসরি নিষেধ করেছেন এমন কোনো কাজ করে ফেলা মারাত্মক অপরাধ, আর একেই বলা হয় কাবীরাহ গোনাহ বা মহাপাপ।
- এ ছাড়া বাকি পাপসমূহ হল ছোট পাপ বা সাধারণ পাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما

(হে আমার বান্দারা!) তোমরা যদি আল্লাহর নিষেধকৃত মহাপাপ থেকে বিরত থাকো তবে তোমাদের ছোট পাপসমূহ আমি মোচন করে দেব আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাব সম্মানিত আবাসনে তথা জান্নাতে। (৪ নিসাঃ ৩১)

উক্ত আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা যায়; পাপ দুই প্রকার হয়ে থাকেঃ ছোট পাপ ও মহাপাপ।

অনুচ্ছেদঃ ২. পাপ মোচণের উপায়

অযু, সালাত, তিলাওয়াত, সাওম, হাজ্জ, উমরাহ, নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ, মসজিদে যাতায়াত, জ্ঞান অন্বেষণ, তাসবিহ, তাহলিল, মানব কল্যাণ, সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি সৎকাজের মাধ্যমে ছোট পাপসমূহ মাফ হয়ে যায়। এটা আমাদের উপর মহান আল্লাহর বিশেষ দয়া এবং পাপ মোচনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। আর বড়পাপ বা মহাপাপ তাওবাহ ব্যতীত মাফ হয় না। বড়পাপ মাফের বা মোচনের জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হয়।

তাওবাহ পরিচিতিঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। ইসলামে তাওবাহ হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ন এমন একটি নৈতিক ও আদর্শিক বিষয় বাস্তব জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বিষয়ে এবং প্রতিটি কর্মে যার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম গ্রহনের আগে এবং ইসলাম গ্রহনের পরে তথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাওবাহ-ই হল আমাদের মুক্তির ও সফলতার সহজ পথ। তাওবাহর কতগুলো ধাপ রয়েছে। যেমন..

তাওবাহর ১ম ধাপঃ "নীতিগতভাবে সকল প্রকার কুফর ও শিরকের পথ পরিহার করে এক আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া" এটা হচ্ছে তাওবাহর ১ম ধাপ। এমন তাওবাহ ইসলাম গ্রহনের আগেই করে নিতে হয়। নতুবা ইসলাম গ্রহন বিশুদ্ধ হয় না। তাইতো সকল নবী-রাসূলগনই সকল মানুষকে এমন তাওবাহর প্রতি আহবান করেছেন। মুসলিমে বর্নিত এক হাদীছে এসেছে; লোকজনকে আহবান করে নবী স. বলেছেনঃ হে মানুষ! (তুবু ইলাল্লাহ) তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো!

তাওবাহর ২য় ধাপঃ তাওবাহর ২য় ধাপ হচ্ছে; পাপকাজ ও পাপ-পথ পরিহার করে পুন্য পথে ফিরে আসা তথা মন্দকে বাদ দিয়ে ভালো হয়ে যাওয়া। সকল মুসলিমকেই জীবনভর এমন তাওবাহ অব্যাহত রাখতে হয়। তাওবাহ হচ্ছে আমাদের সফলতার সহজতর পথ। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ নূরের ৩১ তম আয়াতে। ইরশাদ হচ্ছে..

হে মুঅমিনগণ! তোমরা সবাই (পাপ-কাজ ও পাপের পথ ত্যাগ করে) আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, এতে তোমরা সফল হতে পারবে।	وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ইস্তিগফারঃ ইস্তগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা, মাফ চাওয়া। পাপ থেকে তাওবাহ করার পর অতীত পাপের উপর অনুসূচনা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পার্থনা করা বা মাফ চাওয়ার নাম ইস্তিগফার।

অনুচ্ছেদঃ ৩. পাপের প্রতিক্রিয়া

পাপ একটি প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম। মানুষের স্বভাবে, জীবনে এবং ঈমানে পাপের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। পাপের প্রতিক্রিয়া হয় ৩ ভাবে। যথা..

প্রতিক্রিয়াঃ ১. পাপের প্রাথমিক প্রভাব পড়ে মানুষের স্বভাব চরিত্রের উপর। মানুষের স্বভাবের উপর ছোট বড় সকল পাপেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই নিজের স্বভাব-চরিত্রকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রতিক্রিয়াঃ ২. মহাপাপ বা কবীরাহ গোনাহ আবার দুই ধরনের, তাই এর প্রতিক্রিয়াও দুই ধরনের হয়ে থাকে। কিছু কাবীরাহ এমন আছে যার প্রভাবে ঈমান দুর্বল ও রোগ্ন হয়ে যায় তবে একেবারে নষ্ট হয় না। তাই আখেরাতে

আল্লাহর করুণা ও ক্ষমার আশা থেকে যায়। যেসব মুসলিম এমন পাপ করে তারা মুঅমিন থাকে না বরং ফাসিক হয়ে যায়। অর্থাৎ কাবীরাহ বা মহাপাপ আমাদের ঈমানে সরাসরি আঘাত করে। এর প্রভাবে ঈমান কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে, আর কখনো একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিক্রিয়াঃ ৩. কিছু কাবীরাহ খুবই ভয়াবহ এবং এর প্রতিক্রিয়াও ধ্বংসাত্বক। এর প্রভাবে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল হয়ে যায়। ফলে অনেক নেক আমল করেও আখেরাতে ক্ষমার কোনো উপায় থাকে না। যেসব মুসলিম এমন পাপ করে তারা আর মুঅমিন থাকে না বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।
যেসব পাপ করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এগুলোকে বলা হয় "নাওয়াকিদু-ল-ঈমান" তথা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। নাওয়াক্কিদু-ল-ঈমানের মূল বিষয়ঃ কুফর ও শিরক। অর্থাৎ কোনো মুসলিম যখন নিজেকে (আধুনিক বা সনাতন) কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে ফেলে তখনি তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)

(হে নবী) তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে "যদি শিরক কর তবে তোমার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে" আর তখন তুমি (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৫)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে কোনো ভাবে কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর কোন মুসলিম এমন করলে সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়তে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। (দেখুনঃ সুরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

অন্যত্র বলা হচ্ছে..

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

..আর যে ব্যক্তি ঈমান আনা সত্বেও কুফর করল তার সকল আমল বরবাদ হয়ে গেল আর আখেরাতে সে (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। (৫ মাইদাহঃ ৫)

ঈমান বিনষ্টকারী এসব কুফর শিরকের অপর নাম নিফাক বা মুনাফাকী। যে মুসলিম এমন কোনো কাজ করল সে মুনাফিক হয়ে গেল। মুনাফিক ব্যক্তি যেহেতু ঈমানশূন্য হয়ে যায় তাই তার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবার হয়ে যায়। ফলে আখেরাতে সে কিছুই পাবে না।
কুফর, শিরক ও নিফাক এ তিনটি পাপই ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। এর কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়লেই ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টিকে আরো সহজ ভাবে বোঝানোর জন্য আমরা এ বিষয় ৩টি নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা করব, অতঃপর অন্যান্য কবীরা গোনাহ বা মহাপাপ সম্পর্কে আলচনা করব, ইন শা-আল্লাহ।

অনুচ্ছেদঃ ৪. পাপের তিন উৎস

পাপের মূল উৎস ৩টি, এ ৩টি-ই মানুষকে পাপের পথে ঠেকে দেয় এবং পাপ কাজে উৎসাহিত করে। আর এ ৩টি হচ্ছেঃ শয়তান, ক্বারীন ও নাফস। আসুন! বিষয়গুলো একটু স্ববিস্তারে জেনে নেই।

পাপের ১ম উৎস শয়তানঃ শয়তান আসলে নির্দিষ্ট কোনো একক ব্যক্তি নয়, শয়তান অনেক ও অগণিত। দুষ্ট আত্মা, দুষ্ট ব্যক্তি ও দুষ্ট শক্তি এরা সকলেই শয়তান। যে সকল দুষ্ট মানুষ ও জিন্ন অন্যকে কূপথে ডাকে বা কূমন্ত্রণা দেয়; তারাই শয়তান। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112)

(মক্কার কাফিররা যেভাবে তোমার সাথে দুশমনি করছে) ঠিক সেভাবেই প্রত্যেক নবীর দুশমন হিসেবে আমি মানুষ ও জিন্ন শয়তানদেরকে লাগিয়ে দিয়েছি। তারা (এই মানুষ ও জিন্ন শয়তানরা) একে অপরকে প্রতারণা মূলক সাজানো কথা শিখিয়ে দেয়। তোমার প্রভু চাইলে কেউ এমনটি করতে পারত না (কিন্তু তারা এমনটি করবেই, কারণ এটাই প্রভুর ইচ্ছা। তাই) তাদেরকে ও তাদের মিথ্যাচারকে উপেক্ষা করে চলো। (৬ আনয়া'মঃ ১১২)

আয়াত পর্যালোচনাঃ উক্ত আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে; যে সকল মানুষ ও জিন্ন নবীদের সাথে শত্রুতা রাখে তারাই শয়তান। উল্লেখ্য সাধারনত অন্য আয়াতে শয়তানদের কথা বলতে গিয়ে জিন্নের কথা আগে বলা হলেও উক্ত আয়াতে মানুষের কথা আগে এসেছে। এ থেকে বুঝা যায় নবী, রাসূল ও ইসলামের বিরোধিতায় জিন্ন শয়তানদের চেয়ে মানুষ শয়তানদের ভূমিকাই বেশী থাকবে।

অন্য আয়াত থেকে বুঝা যায়; যে বা যারা অন্যকে কুমন্ত্রনা দেয়, কুপথে ডাকে তথা পাপের পথে আহবান করে তারাই শয়তান। হোক তারা জিন্ন বা ইনসান। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَٰهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)

বলো! আমি সুরক্ষা চাই মানুষের প্রভুর কাছে, মানুষের মালিকের কাছে, মানুষের ইলাহের কাছে, খান্নাসের (শয়তানের) কুমন্ত্রণার অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, (হোক সে) জিন্ন অথবা মানুষ (জাতিভুক্ত, মানে যে জিন্ন বা মানুষ পাপের পথে আহ্বান করে সে-ই শয়তান। উক্ত সূরায় স্পষ্ট করে একথাই বলা হয়েছে)

আল-কুরআনের অনেক আয়াতে ইসলাম বিরুধী পাপিষ্ঠ নেতাদেরকেও শয়তান বলা হয়েছে। যেমন..

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ(14)

মুঅমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করলে এরা বলে "আমরাও মুঅমিন"। আর তাদের শয়তানদের (নেতাদের) সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে "আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি" (ঈমানের কথা বলে) তাদের সাথে কেবল উপহাসই করে থাকি। (২ বাক্বারাহঃ ১৪)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। আসলে শয়তান কোনো একক ব্যক্তি নয়। শয়তান আমাদের পরিবারের কেউ হতে পারে, সমাজের কেউ হতে পারে, হতে পারে বন্ধুদের কেউ। আর এবিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে শয়তানগণ। শয়তানদের সর্বাধিনায়ক হল ইবলিস।

ইবলিস থেকে শয়তানঃ শয়তান অনেক হলেও তাদের মূল নেতা একজন, ইবলিস। ইবলিস আসলে জিন্ন জাতিভুক্ত। ইবলিস ফিরিস্তাদের সঙ্গে থাকত, ইবলিস ছিল আল্লাহর ইবাদাতে নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু আদমকে সিজদাহ করতে বলা হলে ইবলিসের ইগোতে লাগে, তাই সে আল্লাহর কথা অমান্য করে পাপ করে ফেলে। পরে পাপের পঙ্কে সাফাই গেয়ে হয়ে যায় কাফির, কুফরের উপর দম্ভ করার কারণে তাকে লা'নত করা হয়, ফলে সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে শয়তানে পরিনত হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34)

(জ্ঞান প্রতিযোগিতায় আদমের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণিত হবার পর আল্লাহ আদমকে আনুষ্ঠানিক সম্মাননা দেবার ব্যবস্থা করলেন। এঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলছেন) আমি তখন ফিরিস্তাদের বললামঃ তোমরা আদমকে (সম্মান কর এবং সম্মাননার পদ্ধতি হিসেবে) সিজদাহ কর। তারা সবাই সিজদাহ করল তবে ইবলিস করল না। সে অবাধ্য হল, অহংকার করল আর হয়ে গেল কাফির। (২ বাক্বারাহঃ ৩৪)

জ্ঞাতব্যঃ দম্ভ ও অহংকার শয়তানের স্বভাব। আল্লাহ, রাসূল বা ইসলামী বিধানের সাথে দম্ভ করা কুফর। সুতরাং যে মানুষ এমন কোন বিষয়ে দম্ভ করবে, অহংকার করবে সে হেদায়াত বঞ্চিত ও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

আইন ও বিধানঃ এ সিজদাহ ছিল মাথা নত করে সম্মান জানানো। যা আগেকার অনেক শারীয়া'হ মতে বৈধ ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃর শারীয়া'হ মতে এটা অবৈধ এবং শিরকের অন্তর্গত।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে..

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ (35)

আল্লাহ বললেনঃ ইবলিস! তোমার কী হয়েছে, তুমি কেন সিজদাহ করলে না? সে বললঃ আপনি যে মানুষকে ঠনঠনে শুকনা মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন আমি তাকে সিজদাহ করতে পারব না। আল্লাহ বললেনঃ এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি অভিশপ্ত। বিচার দিন পর্যন্ত তোমার উপর লা'নত বলবত থাকবে। (১৫ হিজরঃ ৩২-৩৫)

উল্লেখ্য আল্লাহর রহমত থেকে চিরতরে বিঞ্চিত করাকে লা'নত বলা হয়। আল্লাহর লা'নতের প্রভাবে দুনিয়ায় হয় হেদায়াত বঞ্চিত আর আখেরাতে জান্নাত বঞ্চিত।

শয়তানের পলিসিঃ শয়তানের পলিসি হল মন্দকে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করা এবং নানা প্রকার ছল-চাতুরীর মাধ্যমে মানুষ ও জিন্ন জাতিকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40)

সে বললঃ হে রাব্ব! যাদের জন্য আপনি আমাকে বিপদগামী করেছেন আমি তাদের জন্য (পাপকাজ ও পাপ পথকে) শোভিত করে দেখাব এবং তাদের সবাইকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে বিপথে নিয়ে আসব। তবে যারা আপনার খাঁটি বান্দা তাদেরকে শুধু পারব না। (১৫ হিজরঃ ৩৯-৪০)

পর্যালোচনাঃ উল্লেখ্য আদম আ.কে ধোকা দিতে ইবলিস নিষিদ্ধ গাছের নাম দিয়েছিল "শাজারাতু-ল-খুলদ" মানে বৃক্ষ চিরন্তন। মানব শয়তানরা এখনো একই পলিসি গ্রহন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। যেমন..

- নাস্তিক্যবাদের নাম মুক্ত চিন্তা আর ইসলামের পক্ষে কথা বলার নাম ধর্মান্ধতা,
- ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার নাম বাক স্বাধিনতা আর ইসলামের পক্ষে বললে মৌলবাদ,
- উলঙ্গপনার নাম নারী স্বাধিনতা আর হিজাব করার নাম নারী অধিকার খর্ব করা,
- গার্ল ফ্রেন্ড রেখে যিনা করার নাম ভালোবাসা আর দুইটা বিয়ে করার নাম নারী অধিকার হরন,
- শিক্ষক তার ছাত্রীকে যিনার প্রস্তাব করার নাম আধুনিকতা আর বিয়ের প্রস্তাব করার নাম লুচ্চামি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাপের ২য় উৎস ক্বারীনঃ পাপের ২য় উৎস ক্বারীন। ক্বারীন অর্থ সঙ্গী। মানব শিশু জন্মের পর থেকেই দুইজন ক্বারীন তার সঙ্গী হয়ে যায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গেই থাকে। এদের একজন তার দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তা ক্বারীন আর একজন তাকে বিপথগামী করার জন্য ইবলিস কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত জিন্ন ক্বারীন। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25)

আমি তাদের (প্রতিটি মানুষ ও জিন্নের) জন্য ঠিক করে দিয়েছি ক্বারীন (শয়তান সঙ্গী।) যারা তাদের সামন ও পিছনকে তথা অতীত ও ভবিষ্যতকে শোভিত করে দেখায়। ইতোপূর্বে যেসব জিন্ন ও মানুষের ব্যাপারে (আমার আযাবের) বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে এদের জন্য এটাই অবধারিত ছিল; নিশ্চয় এরা চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ। (৪১ ফুসসিলাতঃ ২৫)

ফিরিস্তা ক্বারীনের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23)

সাকরাতুল-মাওত (মৃত্যুযন্ত্রণা) সময়মতই চলে আসবে। (বলা হবে) এটাই সেই মৃত্যু যা থেকে তুমি পালাতে চেয়েছিলে। আর (প্রথমে মহাপ্রলয়ের, পরে হাশরে জমায়েতের জন্য) শিঙ্গা ফুঁকা হবে, এটাই প্রতিশ্রুত দিন। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে (হাশরের মাঠে) হাজির করা হবে, সঙ্গে থাকবে একজন পরিচালক আর একজন সাক্ষী। (বলা হবে) তুমি এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলে (আজ) আমরা তোমার সকল আবরণ সরিয়ে দিয়েছি। তুমি আজ প্রত্যক্ষ দেখছ। তখন তার ক্বারীন (ফিরিস্তা) বলবেঃ এইতো আমার কাছে (তোমার) আমলনামা। (৫০ ক্বাফঃ ১৯-২৩)

আর শয়তান ক্বারীনের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27)

তার অন্য ক্বারীন (শয়তান) বলবেঃ হে রাব্ব! আমি তাকে বিভ্রান্ত করিনি, সে নিজেই চরম বিভ্রান্ত ছিল।

(৫০ ক্বাফঃ ২৭)

হাদীছ থেকে জানা যায়; মানব শিশু জন্মের সাথে সাথে তার সঙ্গে দুইজন ক্বারীন নিযুক্ত করে দেয়া হয়। একজন ফিরিস্তা ক্বারীন আর একজন শয়তান ক্বারীন। যেমন..

আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে দুইজন ক্বারীন থাকে। একজন জিন্ন আর একজন ফিরিস্তা। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সঙ্গেও..? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ.., তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার (শয়তান) সঙ্গী আত্মসমর্পণ করেছে। সে আর আমাকে মন্দ কথা বলে না। (মুসলিমঃ ২৮১৬/৫০৩৯)

পাপের ৩য় উৎস নাফসঃ পাপের ৩য় উৎস আমাদের নিজের নাফস। নাফস অর্থ আত্মা। প্রতিটি মানুষের মাঝে তিনটি করে আত্মা রয়েছে। যথা..

- ধিক্কারকারী আত্মা (নাফস লাওয়্যামাহ)
- প্রশান্ত আত্মা (নাফস মুত্বমাইন্নাহ)
- প্ররোচনাকারী আত্মা (নাফস আ'ম্মারাহ।) এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

✓ না.., ধিক্কারকারী আত্মার (নাফস লাওয়্যামাহর) কসম! (৭৫ ক্বিয়ামাহঃ ২)

✓ হে প্রশান্ত আত্মা! (নাফস মুত্বমাইন্নাহ) আনন্দিত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রভুর কাছে ফিরে আসো। আমার বান্দাদের দলে শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ আল-ফাজরঃ ২৭-৩০)

✓ (ইউসুফ বলল) আমি নিজেকে দোষমুক্ত ভাবি না। কারণ প্ররোচনাকারী আত্মা (নাফস আ'ম্মারাহ) মন্দকাজে প্ররোচিত করে থাকে। (ইউসুফঃ ৫৩)

পর্যালোচনাঃ নাফস আ'ম্মারাহ শয়তানের বন্ধু আত্মা। শয়তান যখন কাউকে কুমন্ত্রনা দেয় তখন এ আত্মা শয়তানের কুমন্ত্রণা শুনে মানুষকে হতাশাগ্রস্ত করে এবং মন্দকাজে প্ররোচনা দেয়। আর এসবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ পাপ করে। কিন্তু মানুষের অন্য আত্মা পাপ কাজে সায় দেয় না। তাই পাপ করতে মানুষ অপরাধ বোধ করে, দ্বিধা-দ্বন্দে ভোগে, লুকোচুরি করে।

মানুষ যত পাপ করে নাফস আ'ম্মারাহ তত শক্তিশালী হয় আর অন্য আত্মা দুটি দুর্বল হতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে নাফস আ'ম্মারাহ অধিক শক্তিশালী আর অন্য আত্মা দুটি অতি দুর্বল হয়ে যায়। এমন হয়ে গেলে মানুষ পাপ করে আনন্দ পায়। পাপ করে তখন আর অপরাধবোধ জাগে না। সে তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে পাপ করে বা করতে পারে।

মানুষ পাপ করার পর নাফস লাওয়্যামাহ তাকে ধিক্কার দেয়, তিরস্কার করে, তার ভিতর অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ফলে মানুষের ভিতর অনুশোচনা তৈরি হয়, অপরাধবোধ জাগ্রত হয় এবং এ কথা মেনে নিয়ে মানুষ তখন ক্ষমা চায়, তাওবাহ করে, নিজেকে শুধরে নেয়।

ফিরিস্তা ক্বারীনের বন্ধু আত্মা হলো নাফস মুত্বমাইন্নাহ। মুত্বমাইন্নাহ মানুষের ভালো আত্মা। এ আত্মা মানুষকে শান্তি দেয়, সান্তনা দেয়, ভালো কাজে উৎসাহ দেয়। মানুষ ভালো কাজ করলে এ আত্মা আনন্দ পায়, খুশী হয়, তখন এ আত্মার শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যায়। মানুষ যত ভাল কাজ করে নাফস মুত্বমাইন্নাহর শক্তি গাণিতিক হারে বাড়তে থাকে।

নাফস লাওয়্যামাহ মুত্বমাইন্নাহর সহযোগী শক্তি। মানুষ ভালোকাজ করলে উভয় আত্মা শক্তিশালী হয়ে একজোট হয়ে যায় এবং নাফস আ'ম্মারাহকে কোণঠাসা করে ফেলে। ফলে নাফস আ'ম্মারাহ দুর্বল হয়ে নিরুপায় ও অসহায় হয়ে পড়ে। তখন এ মানুষটি হয়ে যায় ভালো মানুষ। এমন মানুষ সৎকাজে আনন্দ পায় আর পাপকাজ সহ্য করতে পারে না। কোনো পাপ দেখলে তখন সে রেগে যায় এবং প্রতিহত করতে উদ্যত হয়।

এমতাবস্থায় কোনো পাপ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। নাফস মুত্বমাইন্নাহ মানুষকে ভালোকাজে উৎসাহ দেয়। তাই বলা হয়েছেঃ হে প্রশান্ত আত্মা! (নাফস মুত্বমাইন্নাহ) আনন্দিত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রভুর কাছে ফিরে আসো। আমার বান্দাদের দলে শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ আল-ফাজরঃ ২৭-৩০)

অনুচ্ছেদঃ ৫. ঈমান ও আ'মাল বিনষ্টকারী পাপসমূহ

ইতোপূর্বে আমরা জেনে এসেছি পাপ দুই প্রকার হয়ে থাকেঃ কাবীরাহ ও সাগীরাহ তথা মহাপাপ ও সাধারণ পাপ। আমরা এ-ও জেনেছি যে, পাপ এক প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম। বিশেষ করে মহা-পাপসমূহ সরাসরি আমাদের ঈমানে আঘাত করে এবং ঈমানের ক্ষতি করে। কিছু মহাপাপ ঈমানও আ'মালকে ধ্বংস করে দেয় আর কিছু মহাপাপ ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে।

যেসব মহাপাপ ঈমান ও আ'মালকে একেবারে ধ্বংস ও অকার্যকর করে ফেলে এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম মহা-পাপ, এগুলোকে বলা হয় "ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ"।

ঈমান বিনষ্টকারী পাপ আসলে ৩টাঃ কুফর, শিরক ও নিফাক্ব বা মুনাফিক্বী। কোনো মুসলিম যদি কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ে তবে তার ঈমান বিনষ্ট ও অকার্যকর হয়ে যায় এবং তখন এ পাপের নাম হয়ে যায় নিফাক্ব বা মুনাফিক্বী। আর যে ব্যক্তির দ্বারা এ পাপ সংঘটিত হয় সে হয়ে যায় মুনাফিক।

মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া বা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাও নিষিদ্ধ। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না। সুতরাং জীবন-মরনের চেয়েও আরো বেশী গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে ঈমান বাচানো। ঈমান বাচাতে হলে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে অবশ্যই কুফর, শিরক ও মুনাফিক্বী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই আসুন! কুফর, শিরক ও মুনাফিক্বী সম্পর্কে অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু জেনে নেই।

আর আরো ৩টি পাপ এমন আছে যা আমাদের আ'মালকে নিস্ফল করে দেয়। যথা..

(১) রিয়া তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য থেকে কিছু পাবার জন্য বা অন্যকে খুশী করার জন্য আ'মাল করা,

(২-৩) কাউকে দান বা অনুদান দিয়ে অথবা কারো প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে কষ্ট দেওয়া বা খোটা দেওয়া তথা দান বা অনুদানের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

২য় অধ্যায়ঃ কুফর

প্রারম্ভিক কথাঃ কুফর ও শিরক আসলে নৈতিক, আদর্শিক, বিশ্বাসগত ও কার্যকারী পাপ। কুফর ও শিরক ধ্বংসাত্বক, ঈমান ও আ'মাল বিনষ্টকারী মহাপাপ। কুফর বা শিরকের প্রভাবে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম যদি সনাতন বা আধুনিক কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ে তবে সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যায়। তখন তার নামায, রোজা, হাজ্জ, যাকাতসহ সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তাই সাবধান! বন্ধুগণ! সাবধান!!

বুঝার সুবিধার্থে এ অধ্যায়কে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যথা..

অনুচ্ছেদঃ ১. কুফর পরিচিতি
অনুচ্ছেদঃ ২. কুফরের প্রকারভেদ
অনুচ্ছেদঃ ৩. কুফরের পরিনতি
অনুচ্ছেদঃ ৪. কাফিরদের ব্যাপারে ইসলামী বিধান
অনুচ্ছেদঃ ৫. ইসলামী দেশে কাফির মুশরিকের নাগরিক অধিকার
অনুচ্ছেদঃ ৬. কাফির মুশরিকদের স্বভাব
অনুচ্ছেদঃ ৭. কাফির মুশরিকদের দম্ভোক্তি
অনুচ্ছেদঃ ৮. কাফির মুশরিকদের কামনা
অনুচ্ছেদঃ ৯. কাফির মুশরিকদের আদর্শিক অনুকরনের প্রভাব
অনুচ্ছেদঃ ১০. কাফিরদের শ্রেণী বিন্যাস
অনুচ্ছেদঃ ১১. কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের করণীয়
অনুচ্ছেদঃ ১২. কুফরের কিছু প্রচলিত নমুনা
অনুচ্ছেদঃ ১৩. কুফর চিনার কিছু সহজ সূত্র

অনুচ্ছেদঃ ১. কুফর পরিচিতি

শব্দ পরিচিতিঃ কুফর আরবী শব্দ। কুফর অর্থ অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা, অমান্য করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, গোপন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। সে মতে..

- আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- আল্লাহর দেওয়া কোনো বিধান প্রত্যাখ্যান বা বর্জন করা;
- আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;

- আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা;
- আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা এবং এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাঁধা দেওয়া বাঁধার সৃষ্টি করা;
- আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা;

তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও..

- যাদু করা,
- আল্লাহ, কোনো রাসূল বা কোনো ফিরিস্তাকে অসম্মান করা বা গালি দেওয়া
- আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর।

আল-কুরআনে কুফর শব্দের ব্যাবহারঃ আল-কুরআনে কুফর শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন..

১. গোপন করাঃ আল-কুরআনে কুফর শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এর ১টি হল গোপন করা। বলা হচ্ছে..

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20)

জেনে রাখো! দুনিয়ার জীবন খেলা-ধুলা, রঙ্গ-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পরস্পরে অহমিকা, সম্পদ ও সন্তানের (তথা ধন ও জনের) প্রতিযোগিতা (এসব) ছাড়া আর কিছুই নয়। (জীবনের উপমা কৃষির শুরুর দিকের) বৃষ্টির মত, যার প্রভাবে বেড়ে উঠা চারাগুলো **কুফফারকে** (কৃষকগণকে) বিমোহিত করে তুলল এবং পরে (নিয়মিত বৃষ্টির অভাবে) সব শুকিয়ে হলুদ হয়ে খড়কুটায় পরিণত হয়ে গেল। (পাপিষ্ঠদের জীবন এভাবেই ব্যার্থ হয়) তাদের তরে অবধারিত হয় আখেরাতের কঠিন আযাব আর (মুঅমিনদের জন্য রয়েছে) আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাধারণ ক্ষমা। দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। (৫৭ আল-হাদীদঃ ২০)

কারণ বিশ্লেষনঃ এখানে কৃষক বুঝাতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কুফফার। কৃষককে কুফফার বলার কারণঃ কুফর শব্দের এক অর্থ গোপন করা, সে মতে কাফির অর্থ গোপনকারী আর কুফফার অর্থ বারবার গোপনকারী বা অধিক গোপনকারী। কৃষক যেহেতু তার ফসলের বীজ অধিকহারে মাটিতে পুতে রাখে তাই তাদেরকে কুফফার বলা হয়েছে।

আয়াত বিশ্লেষণঃ মানব জীবনের বেশ কয়েকটি ধাপ রয়েছে এবং প্রতিটি ধাপেই মানুষের অভিলাষ থাকে ভিন্ন ভিন্ন, জীবনের একেক ধাপে এসে স্বভাবগতভাবেই মানুষের ঝোঁক একেক দিকে বেড়ে যায়, জীবনে প্রতিটি ধাপেই মানুষের পছন্দ ও অভ্যাস থাকে ভিন্ন ভিন্ন। উক্ত আয়াতে এসব বিষয়াদির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তারপর বাতলে দেওয়া হয়েছে সর্বশেষ পরিণতির কথা। যেমন..

- আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে দুনিয়ার জীবন হলো খেলা-ধুলাঃ আসলেই মানব জীবনের সূচনা হয় খেলা-ধুলা দিয়ে। খেলা-ধুলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ আর ঝোঁক দিয়েই মানব জীবন শুরু হয়। মানব শিশু যখন একটু একটু বুঝতে শুরু করে তখন সে শুধু খেলতে চায়, খেলনা প্রত্যাশা করে। মানব শিশু তার চুখের সামনে যা দেখে তাকেই খেলনা মনে করে। মাঝে মাঝে খেলনার ছলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বস্তুও নষ্ট করে ফেলে। খেলা-ধুলার প্রতি শিশুদের এমন ঝোঁক দেখে আমরাও তাদেরকে খেলনা কিনে দেই, খেলনা উপহার দেই।
- উক্ত আয়াতে খেলাধুলার পর বলা হয়েছে রঙ্গ-তামাশার কথা। অর্থাৎ শৈশবে খেলা-ধুলার ঝোঁক বেশি থাকলেও কৈশোরে এসে এর সাথে যুক্ত হয় রঙ্গতামাশা। তখন রঙ্গতামাশার প্রতি ঝোঁক বেড়ে যায় এবং সবকিছু নিয়েই রঙ্গতামাশা করা অভ্যাসে পরিণত হয়।
- রঙ্গতামাশার পর বলা হয়েছে সাজসজ্জার কথা। অর্থাৎ কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করার পর সাজসজ্জার প্রতি মানুষের ঝোঁক অধিক বেড়ে যায়। তখন মাথার চুল, গায়ের পোশাক, পায়ের জোতা, ইত্যাদি সবকিছুকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিজেকে একজন সুন্দর ও স্মার্ট যুবক/যুবতি হিসেবে উপস্থাপন করতে ভালো লাগে।
- তারপর বলা হয়েছে অহমিকার কথা। অর্থাৎ তারপর মানুষের মনে তৈরি হয় অহমিকা। মানুষ তখন নিজেকে অন্য সকলের থেকে আলাদা ভাবতে শুরু করে।
- এরপর মানুষের মনে সম্পদের মোহ দানা বাঁধে এবং সম্পদের প্রতি তার ঝোঁক ও অভিলাষ বেড়ে যায় আর তখন থেকেই শুরু হয় সম্পদের প্রতিযগিতা।
- ইতিমধ্যেই সে বিয়ে করে, সংসার করে, সন্তানদের বাবা-মা হয়। অতঃপর শুরু হয় সন্তান নিয়ে প্রতিযগিতা। সবাই চায় তার সন্তান সফল হোক, অন্য সকলের চেয়ে অনেক বড় হোক, অনেক উন্নতি করুক।
- অতঃপর মানব জীবনকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে আর মানুষের অভিলাষ ও পছন্দগুলোকে তুলনা করা হয়েছে কৃষকের মন মাতানো চারাগাছ হিসেবে, নিয়মিত বৃষ্টি না পেলে যা শুকিয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করে খড়কুটায় তথা আবর্জনায় পরিণত হয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আজ যেসব বস্তু মানুষের কাছে মন মাতানো ও লোভনীয়, কাল এটাই তার কাছে আবর্জনা হয়ে যায়। আজ যে জিনিষের জন্য মানুষ লালায়িত কাল এটাই তার কাছে অবহেলার বস্তু। আজ যে খেলনাটি তার কাছে অনেক কিছু, কাল এটিই তার কাছে আবর্জনা। আজ যে পোশাকটি তার সবচেয়ে বেশী পছন্দের, কাল এটা গায়ে জড়াতেও মন চায় না। আজ যে মোবাইল হাতে নিয়ে সে নিজেকে গর্বিত মনে করছে, কাল এটাই তার কাছে সেকেলে মনে হয়। আজ যার সঙ্গ তার মনে শিহরণ তোলে, কাল ওই মানুষটিই তার জন্য বিরক্তিকর হয়ে যায়। ইত্যাদি। ইত্যাদি। এটাই হলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় ক্ষণস্থায়ী সামগ্রীর পরিণতি।
- সর্বশেষ বলা হয়েছেঃ যে বা যারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার এসব ক্ষণস্থায়ী সামগ্রীর মোহে পড়ে প্রতারিত হবে তাদের তরে আছে জাহান্নামের কঠিন আযাব আর যে বা যারা এসবের মায়া বিসর্জন দিয়ে মহান আল্লাহর পথে অবিচল থেকে আল-কুরআনের নিয়মনীতি মেনে জীবন পরিচালিত করবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সাধারণ ক্ষমা। **সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ মহান, আল্লাহর কথাও কত মহান।**

২. অকৃতজ্ঞ হওয়াঃ আল-কুরআনে কুফর শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এর ১টি হল অকৃতজ্ঞ হওয়া। বলা হচ্ছে..

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7)

তোমাদের প্রভু ঘোষণা করেছেনঃ "তোমরা যদি শোকর কর (মানে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো) তবে আমি তোমাদেরকে (আমার নিয়ামত) অনেক অনেক বাড়িয়ে দেব আর যদি কুফর কর (মানে অকৃতজ্ঞ হয়ে যাও) তবে (মনে রেখো!) আমার আযাব বড় কঠিন" (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শোকর করা।) (১৪ ইবরাহীমঃ ৭) উল্লেখ্য এখানে কুফর শব্দটি অকৃতজ্ঞতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. কুফর অর্থ দুশমনি, শত্রুতা, হত্যা চেষ্টা, বিশ্বাস ঘাতকতাঃ আল-কুরআনে কুফর শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এর ১টি হল ঘাতক হয়া, বিশ্বাস ঘাতকতা, শত্রুতা করা, হত্যা চেষ্টা করা, ইত্যাদি। ইরশাদ হচ্ছে..

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)

(ইয়াহুদ জাতি ঈসা আ.কে মেনে নেয়নি। বরং তারা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল) ঈসা যখন তাদের কুফর (হত্যা ষড়যন্ত্র) অনুভব করে ফেলল তখন বললঃ কে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? হাওয়ারীগণ বললঃ আমরা আল্লাহর (জন্য আপনার) সাহায্যকারী হব। আমরা ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষীঃ আমরা মুসলিম। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৫২) উল্লেখ্য এখানে কুফর শব্দটি তাদের অবাধ্যতা, শত্রুতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, হত্যা চেষ্টা, ইত্যাদি অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ আলিমগণ দলে দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি দলই নবীর আদর্শের সাথে নিজেদের মতাদর্শ মিশিয়ে মিশ্র পথ বানিয়ে ছিল। এমতাবস্থায় ঈসা আঃ আগমন করলেন। ইয়াহুদ আলিমগণ দলবাজির ঊর্ধ্বে উঠে ঈসা আঃকে মেনে নিতে পারেনি। তারা ঈসা আঃর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করেছে। তাকে হেও করার জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছে, জারজ বলেছে। তথাপিও ঈসা আঃর উত্থান ঠেকাতে না পেরে তাকে হত্যার জন্য প্রায় ৪হাজার অনুসারী নিয়ে তার বাড়ী অবরোধ করেছে এবং ঘর থেকে বের হলেই শূলীতে চড়ানোর জন্য বিরাট মঞ্চ তৈরি করেছে। তিনি সাহায্যের আবেদন জানালে হাওয়ারীগণ এগিয়ে আসে এবং তাঁর ঘরে অবস্থান নেয়। ঈসা আঃর হাওয়ারী (সঙ্গী) ছিল ১২ জন।

৪. অবজ্ঞা, অবহেলাঃ আল-কুরআনে কুফর শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এর ১টি হল অবজ্ঞা। যেমন..

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)

(কুফরের) দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ এক জনপদের বর্ণনা দিচ্ছেনঃ যেখানে শান্তি ছিল, নিরাপত্তা ছিল, সবদিক থেকে নিয়মিত আসত জীবনের নানা উপকরণ। কিন্তু এখানকার বাসিন্দারা আল্লাহর নিয়ামতের কুফর করেছে (অবজ্ঞা,অবহেলা, অবমর্যাদা করেছে) ফলে আল্লাহ তাদের আস্বাদন করিয়েছেন ভীতি ও ক্ষুধার আবরণ। (১৬ নাহ'লঃ ১১২) উল্লেখ্য এখানে কুফর শব্দ দ্বারা যেসব অর্থ বুঝানো হয়েছে এর একটি হচ্ছে অবজ্ঞা বা অমর্যাদা।

৫. অমান্য করাঃ আল-কুরআনে কুফর শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এর ১টি হচ্ছে অমান্য করা। যেমন..

وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (60)

আর এটাই আ'দ (জাতির ইতিহাস) তারা প্রভুর আয়াতসমূহ (বিধান ও নিদর্শনসমূহ মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে, রাসূলের অবাধ্য হয়েছে আর অবাধ্য ও দাম্ভিক নেতাদের অনুকরণ করেছে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের পিছু নিয়েছে লা'নত শুনো! আ'দ তাদের প্রভুর সাথে **কুফর** করেছে (প্রভুর বিধান অমান্য করেছে) শুনো! হূদের জাতি আ'দ অতীত হয়ে গেছে। (১১ হূদঃ ৫৯-৬০) উল্লেখ্য এখানে কুফর শব্দ দ্বারা যেসব অর্থ বুঝানো হয়েছে এর একটি হচ্ছে অমান্য করা।

৬. অবিশ্বাস করাঃ আল-কুরআনে কুফর শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এর ১টি হল অবিশ্বাস করা। যেমন..

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33)

জাতির নেতারা যারা কুফর করে, আখেরাত বিশ্বাস করে না, দুনিয়ায় যাদেরকে আমি অনেক প্রাচুর্য দিয়েছি, তারা (জনতাকে) বলেছেঃ সে তোমাদের মতই মানুষ, তোমাদের মত খায়, তোমাদের মত পান করে। (২৩ মুঅমিনূনঃ ৩৩) উল্লেখ্য এখানে "আখেরাত বিশ্বাস করে না" বলে কুফর এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭. কুফর অর্থ বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করাঃ আল-কুরআনে কুফর শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এর মাঝে ১টি হল বর্জন প্রত্যাখ্যান করা। ইরশাদ হচ্ছে..

(74) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76)

দাম্ভিক নেতারা অসহায় মুঅমিনদের বললঃ তোমরা কি মনে কর, স্বালিহ আল্লাহর রাসূল? মুঅমিনরা বললঃ তাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা সব বিশ্বাস করি /মেনে নিয়েছি। দাম্ভিক নেতারা বললঃ তোমরা যা মেনে নিয়েছ আমরা তা **বর্জন /প্রত্যাখ্যান** করছি। (৭ আ'রাফঃ ৭৫-৭৬) উল্লেখ্য এখানে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান বুঝাতে কুফর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই হচ্ছে আল-কুরআনে কুফর শব্দটি ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত নমুনা। সুতরাং আশা করি বুঝতেই পারছেন যে..

- আল্লাহর দেওয়া কোন তথ্য গোপন করলে কুফর হবে
- আল্লাহর দেওয়া কোনো বিধানকে নীতিগতভাবে না মানলে কুফর হবে
- আল্লাহর দেওয়া কোনো বিষয়কে অবজ্ঞা বা অবহেলা করলে কুফর হবে
- আল্লাহ আল্লাহ, রাসূল বা আল্লাহর পথযাত্রীদের সাথে শত্রুতা বা তাদের হত্যা চেষ্টা করলে কুফর হবে
- আল্লাহর দেওয়া কোনোকিছুকে বর্জন বা প্রত্যাখ্যান করলে কুফর হবে
- আল্লাহ বা রাসূলের দেওয়া কোনো তথ্য অস্বীকার করলে কুফর হবে
- আল্লাহ বা রাসূলের দেওয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করলে কুফর হবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।।

অনুচ্ছেদঃ ২. কুফরের প্রকার ভেদ

কুরআন ও হাদীছে কুফর শব্দটি যেমন ইসলামের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনীভাবে ঈমানের বিপরীতেও ব্যবহৃত হয়েছে। তাই কুফরকে আমরা দুইভাবে বুঝতে পারিঃ ইসলাম পরিপন্থী কুফর ও ঈমান পরিপন্থী কুফর।

ইসলাম পরিপন্থী কুফরঃ "যে বা যারা নীতিগতভাবে আল্লাহর মনোনিত দ্বীন (জীবন আদর্শ) ইসলামকে গ্রহন করে না তাদেরকে বলা হয় কাফির"। আর তাদের ওই কুফরই হল ইসলাম পরিপন্থী কুফর। যে বা যারা এমন কুফর করে তারাই আমাদের সমাজে কাফির হিসেবে পরিচিতি পায়। ইসলামের বিপরীতে কুফর শব্দটি আল-কুরআনের অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন..

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)

আল্লাহ কোনো মানুষকে কিতাব, "হুকম" ও নবুয়ত দেওয়ার পর সে বলবে "আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাসত্ব/ইবাদাত কর"! এমন হতেই পারে না। বরং (সে বলবে) প্রভু ভক্ত হও, (প্রভুর) কিতাব শিক্ষা কর এবং অধ্যয়ন কর। নবী কখনো কোনো ফিরিস্তা বা নবীকে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য বলতে পারে না। তোমরা **ইসলাম** গ্রহনের পর নবী কি করে **কুফরে**র কথা বলবে? (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৭৯-৮০) আরো অনেক আয়াতে ইসলামের বিপরীতে কুফর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ঈমান পরিপন্থী কুফরঃ যে মুসলিম ইসলাম গ্রহন করার পর কোনো প্রকার কুফরে জড়িয়ে নিজের ঈমানকে বিনষ্ট করে ফেলল তার এ কুফর হল ঈমান পরিপন্থী কুফর। এমন কুফরও আসলে কুফর এবং এর পরিনতিও চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তবে বাহ্যত ইসলাম গ্রহনের কারনে দুনিয়ার জীবনে এদেরকে কাফির না বলে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিকরা সাধারণ কাফিরের চেয়েও জঘন্য, এরা প্রতারক শ্রেনীর কাফির। তাই এদের সাজা হবে সাধারণ কাফিরের থেকেও কঠিন। এদের জন্য জাহান্নামের নিম্নতম গহবর। আল-কুরআনের অনেক জায়গায় এমন কুফরের কথা বলা হয়েছে এবং ঈমানের বিপরীতে কুফর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137)

ওহে যারা (শুধু মুখে) ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ উপর, রাসূলের উপর, রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং ইতোপূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের উপর সঠিকভাবে ঈমান আনো। আর (শুনো!) যে ব্যক্তি আল্লাহ, আল্লাহর ফিরিস্তা, আল্লাহর কিতাবসমূহ, আল্লাহর সকল রাসূল ও আখেরাতের উপর সঠিকভাবে ঈমান আনল না সে (মুসলিম হওয়া স্বত্তেও) চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। আর (মনে রেখো!) যারা **ঈমান** আনল, পরে **কুফর** করল, আবার **ঈমান** আনল, আবার **কুফর** করল, অতঃপর কুফরকে পরিপক্ষ করে নিল, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না, পরিচালিত করবেন না সঠিক পথে। (নিসাঃ ১৩৬-১৩৭) উল্লেখ্য উক্ত আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতে কুফর শব্দটি ঈমানের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঈমান পরিচিতিঃ ঈমান অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। ঈমান আনতে হলে ৩টি কাজ করতে হয়। যথা..

- আল্লাহ থেকে আগত সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে এবং এর বিপরীত কোনোকিছু বিশ্বাস করা যাবে না।
- আল্লাহ থেকে আগত যাবতীয় নীতি, আদর্শ ও বিধিবিধানকে নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু মেনে নেওয়া যাবে না।
- ঈমানের ঘোষণা দিতে হয়। (এটা ঈমানের সামাজিক দিক। ঘোষণা না দিয়ে গোপন রাখলেও ঈমান হয়ে যায়। দেখুনঃ সূরাহ গাফিরঃ ২৮)
- বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হয়। (বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে না পারলে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি এমন করে সে আর মুঅমিন তথা ঈমানদার থাকে না বরং ফাসিক হয়ে যায় এবং তাঁর আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়।)

ঈমান ও কুফর শিরকের সংমিশ্রনঃ ইসলাম গ্রহনের পর অনেক মুসলিমই কুফর ও শিরকে জড়িয়ে পড়ে। যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। এদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)	তাদের অনেকেই আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও তারা মুশরিক হয়ে যায় /মুশরিক থেকে যায়। (১২ ইউসুফঃ ১০৬)

ইসলাম গ্রহনের পর কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে এর পরিনতির ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)

(হে নবী) তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে "যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সকল আ'মাল নিস্ফল হয়ে যাবে" এবং তুমি (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৫)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ	..যে ব্যক্তি ঈমান আনা সত্বেও কুফর করল তার সকল আমল বরবাদ হয়ে গেল। আর আখেরাতে সে (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। (৫ মা-ইদাহঃ ৫)

কুফর ও মুনাফিকীঃ ঈমান পরিপন্থী কুফর আসলে কুফর হলেও ইসলামী পরিভাষায় একে নিফাক বা মুনাফিকী বলা হয়। ইসলাম গ্রহনের পর যেব্যক্তি কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে গেল সে দুনিয়ার মানুষের কাছে মুসলিম হিসেবে পরিচিতি পেলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির ও মুশিরক হয়ে গেল। তবে তাদের জীবন যেহেতু ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রন তাই তাদেরকে কাফির বা মুশরিক না বলে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিক আসলে মুসলিম ও কাফিরের সমন্বয়ে গঠিত আলাদা জাতি। মুনাফিকের মাঝে ইসলামও পাওয়া যায় আবার কুফরও পাওয়া যায়। তাই মুনাফিক চেনা বড় কঠিন। এদের ব্যাপারে আমরা আলাদা অনুচ্ছেদ গঠন করেছি। এদের স্বভাব ও পরিনতির কথা মুনাফিক অনুচ্ছেদে আলোচনা হবে, ইন শা-আল্লাহ।

অনুচ্ছেদঃ ৩. কুফরের পরিনতি

কুফর আসলে এক মহা-বিদ্রহের নাম। যে বা যারা কুফর করল তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিদ্রহ করল। আর একেবারে অন্ধ বেকুব ও আহম্মক ছাড়া কেউ এমন করতে পারে না। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131)

পটভূমিঃ দুনিয়াতে যত নবী ও রাসূল এসে ছিলেন সবাই শিরকের বিরোধিতা করেছেন, সবাই তাওহীদের কথা বলেছেন, তাওহীদের পক্ষে কাজ করেছেন। তবে তাওহীদের জন্য ইবরাহীম আঃ'র ত্যাগ ও কুরবানী ছিল অপরিসীম। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাওহীদের দাওয়াতে অবিচল থাকা এবং শিরকের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নেওয়া-ই ইবরাহীম আঃ'র আদর্শ হিসেবে খ্যাতি ও পরিচিতি পেয়েছে। আর এ আদর্শই আখেরাতে মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই এ আদর্শে অবিচল থাকা বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকদের কাজ। আর এ আদর্শ থেকে বিরত থাকা মূর্খতা। ইরশাদ হচ্ছে..

শুধু নির্বোধ লোকেরাই ইবরাহীমের আদর্শ থেকে বিমুখ হয়ে থাকে। আমি এ দুনিয়ায় তাকে মনোনীত করেছি আর আখেরাতে সে সৎলোকদের একজন। প্রভু যখন তাকে বলেছেনঃ "আত্মসমর্পণ কর"। সে তৎক্ষণাৎ বলেছেঃ "আমি রাব্বু-ল-আ'লামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম"। (২ বাক্বারাহঃ ১৩০-১৩১)

যারা কুফর করে দুনিয়া বা আখেরাত কোনো জগতেই এদের পরিনতি শুভ হয় না। বরং উভয় জগতেই এদের পরিনতি হয় ভয়াবহ। এদের ভয়াবহ পরিনতির অনেক কথাই আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব থেকে কয়েকটিমাত্র নিম্নে পেশ করা হল।

পরিনতিঃ ১. নেতৃত্বের অযোগ্য হয়ে যাওয়াঃ কাফিররা যেহেতু আল্লাহ দ্রোহী, দাম্ভিক ও খিয়ানতকারী হয়, তাই তারা নেতৃত্বের অযোগ্য। ইসলামী দেশে বা ইসলামী সমাজে কোনো কাফির সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্টিত হতে পারবে না। মুসলিমের জন্য এদের আনুগত্য করা হারাম। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (48)

কোনো কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য মেনে নেবে না (যদিও এ জন্য কষ্টে পতিত হতে হয়) বরং তাদের দেওয়া কষ্ট/সাজাকে উপেক্ষা করবে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। আর (মনে রাখবে) উকীল (রক্ষক) হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৩৩ আহযাবঃ 48) এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াতে কাফিরের আনুগত্য মেনে নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর হুকুমের বাইরে গিয়ে কোনো কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য করা বিভ্রান্তি, ক্ষেত্র বিশেষে কুফর পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় হল; আমাদের সমাজের অনেকেই নেতা-নেত্রী, বাবা-মা, মুরব্বির আনুগত্য করতে গিয়ে এমন কুফর করে থাকেন। যারা এমন করেন তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তাই সাবধান! বন্ধুগণ! সাবধান!!

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ইসলামী দেশে বা ইসলামী সমাজে কোনো কাফির সর্বোচ্চ আসনে তথা নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে না। তবে দেশের সর্বোচ্চ নেতা মুসলিম হলে কাফির ব্যক্তি এ সরকারের অধীনে কাজ করতে পারবে, এমনকি আঞ্চলিক প্রশাসক বা বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে পারবে। আর যদি কোনো কাফির বা মুনাফিক জবর দখল করে নির্বাহী আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে নীতিগতভাবে তাদের আনুগত্য মেনে নেওয়া হারাম, যদিও এজন্য অনেক সাজা ভোগ করতে হয়।

পরিনতিঃ ২. অন্তরে মোহর পড়ে যাওয়াঃ কুফর মারাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল মহাপাপ। কুফরের প্রভাবে অন্তরে মোহর পড়ে যায়। ফলে ওই ব্যক্তি নৈতিকভাবে চিরতরে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, তার জন্য আর দ্বীনি বিষিয়াদি বুঝা সম্ভব হয়ে উঠে না। ইরশাদ হচ্ছে..

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا	তথা কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তাই ঈমান তারা কমই আনবে। (৪ নিসাঃ ১৫৫)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3)

কারণ তারা ঈমান এনেছে, আবার কুফর করেছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর এটে দেওয়া হয়। তাই তারা (দ্বীনি বিষয়াদি) বুঝতে পারে না। (৬৩ মুনাফিক্বূনঃ ৩)

পরিনতিঃ ৩. আল্লাহর লা'নতে পতিত হওয়াঃ যে বা যারা কুফর করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত এসে পড়ে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (162)

যারা কুফর করে এবং কুফর অবস্থায় মারা যায় তাদের উপর আল্লাহর লা'নত, ফিরিস্তাদের লা'নত, লা'নত সকল মানুষের। তারা এতে (জাহান্নামে) চিরকাল থাকবে। কমানো হবে না আযাব, দেয়া হবে না অবকাশ। (২ বাক্বারাহঃ ১৬১-১৬২)

লা'নত পরিচিতিঃ লা'নত অর্থ অভিশাপ। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর লা'নত মানে হচ্ছে "আল্লাহর রহমত থেকে চির তরে বঞ্চিত করে ফেলা। আল্লাহর লা'নতের প্রতিক্রিয়া হল দুনিয়ার জীবনে হেদায়াত থেকে আর আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া।

পরিনতিঃ ৪. আল্লাহর ক্রোধে পতিত হওয়াঃ কুফরের পরিনতি ধ্বংস, কুফর কাফিরের উপর আল্লাহর ক্রোধকে বাড়িয়ে তুলে, কুফর কাফিরের আখেরাতকে ধ্বংস করে দেয়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (39)

তিনি এ যমীনে তোমাদেরকে খালাইফ (প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রতিষ্ঠিত করার রীতি) বানিয়েছেন। সুতরাং কেউ কুফর করলে এর দায় তাকেই নিতে হবে। কুফর কাফিরদের উপর প্রভুর ক্রোধকে বাড়িয়ে তুলে। কুফর কাফিরদের ধ্বংসকেই কেবল বাড়িয়ে দেয়। (৩৫ ফাত্বিরঃ ৩৯)

পরিনতিঃ ৫. চিরতরে জাহান্নামী হয়ে যাওয়াঃ কুফর কাফিরের জন্য জাহান্নামকে চিরতরে অবধারিত করে ফেলে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ	(পরকালে বলা হবেঃ হে কাফিরের দল) এটাই (তোমাদের কর্মফল) তোমরা এটা আস্বাদন কর। কাফিরদের জন্য অবধারিত রয়েছে জাহান্নামের আযাব। (৮ আনফালঃ ১৪)

পরিনতিঃ ৬. ঈমান ও আমল নস্যাত হয়ে যাওয়াঃ কুফর ঈমান ও আ'মালকে নস্যাত করে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

যে ব্যক্তি ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করল তার সকল আমল বরবাদ হয়ে গেল এবং আখেরাতে সে (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। (৫ মাইদাহঃ ৫)

অনুচ্ছেদঃ ৪. কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে ইসলামী বিধান

যে বা যারা ইসলাম পরিপন্থী কুফর করে বা শিরক করে; তারা অমুসলিম। ফিক্বহী পরিভাষায় তাদেরকে "হারবী কাফির" তথা শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হারবী অর্থ যুদ্ধা বা জঙ্গী। যেহেতু এরা ইসলামী সমাজ ও ইসলামী সরকারের শত্রু পক্ষ তাই ইসলামী বিধান মতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ আর এ জন্য তাদেরকে হারবী বলা হয়। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)

যারা ঈমান আনে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কুফর করে তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূ'তের পথে। সুতরাং (হে আমার বান্দারা!) তোমরা শয়তানের আওলিয়াদের (মিত্রদের) সাথে যুদ্ধ কর। (জেনে রাখো!) শয়তানের চক্রান্ত অবশ্যই দুর্বল হয়। (আল্লাহর অবাধ্য অথা ইসলাম বিরোধী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও শক্তিকে ত্বাগূ'ত বলা হয়। আর সকল ত্বাগূতই শয়তানের মিত্র।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ অসহায় মানুষকে অত্যাচার ও অবিচার থেকে রক্ষা করা এবং সবাইকে তাদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া মুসলিমদের মানবিক বৈশিষ্ট্য এবং এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আল্লাহ প্রদত্ব। এ দায়িত্ব পালন করা জিহাদেরই অংশ এবং এ পথে নিহত হলে শহীদ।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال :أمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ويُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّ الإسلام، وحسابهم على الله تعالى .رواه البخاري ومسلم.

উ'মার বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন (জালিম) লোকদের সাথে যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে; আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, অতঃপর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। তারা যখন এসব করে ফেলবে তখন তাদের

রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের কোনো বিধান লঙ্ঘনের কারনে (বিচারের সম্মুখীন হতে হবে) আর (কে প্রকৃত মুসলিম আর কে জান বাচাতে ইসলাম গ্রহনের বাহানা করেছে এ) হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আইন ও বিধানঃ উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছসহ আরো অনেক আয়াত ও হাদীছে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের যে বিধান দেওয়া হয়েছে এসবই হারবী কাফিরদের ব্যাপারে, যিম্মী কাফিরদের উপর আক্রমন করা নিষিদ্ধ।

তবে কোনো কাফির যদি ইসলামী সমাজ ও ইসলামী সরকারের আনুগত্য মেনে নিয়ে ইসলামী শাসনের আওতাধীন শান্তিপূর্ন সহাবস্থান পছন্দ করে আর ইসলামী সরকার বা কোনো মুসলিম যদি তাদেরকে নিরাপত্তা দেয় তবে তারা নিরাপত্তার আওতাধীন এসে যাবে এবং পরিপূর্ন নাগরিক অধিকার নিয়ে ইসলামী সমাজে বসবাস করতে পারবে। ফিক্বহী পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয় "যিম্মী কাফির" অর্থাৎ যাদের নিরাপত্তা নিশ্চত করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনঃ উল্লেখ্য ইসলামের বিরোদ্ধে পশ্চিমাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হিসেবে ইসলামী সমাজনীতি ও পৌরনীতির বেশকিছু শব্দকে পরিকল্পিতভাবে বদনাম ও অপমানিত করা হয়েছে, এর একটি হল "যিম্মী" শব্দ, তারা যিম্মী বলে বুঝায়; জোরপূর্বক কাউকে আটকে রাখা। অথচ ইসলামে যিম্মী হচ্ছে যে অমুসলিম ব্যক্তি সেচ্ছায় ইসলামী সমাজে থাকতে পছন্দ করেছে এবং নিজ থেকে আবেদনের মাধ্যমে ইসলামী দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছে অর্থাৎ যার নিরাপত্তা নিশ্চত করা হয়েছে। এভাবে কাজী, খলীফা, খেলাফত, জিহাদ, মুজাহিদ, ইত্যাদি শব্দকেও নানাভাবে বদনাম ও অপমানিত করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ বর্তমান বিশ্বে পুজীবাদী অর্থ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর রীতি হিসেবে সরকার জনগণের রোজগার থেকে ১৭%-৫০% পর্যন্ত সরাসরি টেক্স বা কর আদায় করে, এছাড়া প্রতিটি পন্য কিনতে ভি.এ.টি. বা ভ্যাট তো আছেই। কিন্তু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাসূল সা. ও খুলাফা রাশিদীনের সময়ে এমনভাবে টেক্স বা ভ্যাট আদায় করা হত না। এমনকি পরবর্তী খালীফাদের সময়েও না। ইসলামী সরকার মুসলিম নাগরিকদের থেকে যাকাত ও উশুর আর অমুসলিম নাগরিকদের থেকে খারাজ ও জিযইয়াহ আদায় করত। বিশেষ প্রয়োজনে জনগণ ফী সাবীলিল্লাহ সরকারকে অনুদান দিয়ে সাহায্য করবে।

অনুচ্ছেদঃ ৫. ইসলামী দেশে কাফির মুশরিকের নাগরিক অধিকার

ইসলামী দেশে বসবাসকারী কাফির ব্যক্তি পূর্ন স্বাধিনতা ও নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। যেমন..

- নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী মূর্তীপূজাসহ যাবতীয় ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান, পূজা ও ইবাদাতের পূর্ণ স্বাধিনতা
- ইসলামী দেশে নিজ নিজ ধর্মের উপাসনালয় তৈরি করার পূর্ণ স্বাধীনতা
- মদ্য পান, শোকরের মাংস খাওয়াসহ নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিমত খাদ্য ও পানীয় গ্রহনের পূর্ণ স্বাধীনতা
- গান বাজনাসহ নিজ নিজ সংস্কার ও সংস্কৃতি মত সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা
- বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ যাবতীয় নাগরিক স্বাধীনতা
- ব্যবসা বানিজ্য এবং সরকারী, আধাসরকারী ও প্রাইভেট সেকসনে চাকরী করা বা উদ্যোক্তা হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা। ইত্যাদি।।
- এমনকি হারবী কাফিরও যদি যুদ্ধ ছেড়ে আশ্রয় চায় তাকেও আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6)

(যুদ্ধরত) কোনো মুশরিক যদি আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দিও। যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে। (ইসলামী দেশে বসবাস করে ইসলাম সম্পর্কে জানার পর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তোমাদের ভাই হয়ে যাবে। আর যদি ফিরে যেতে চায় তবে) তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিও। কারণ তারা অজ্ঞ জাতি। (৯ তাওবাহঃ ৬)

মানবাধিকারঃ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আয়াতটি একটি মাইলফলক। শুধুমাত্র মানবিক কারণে যুদ্ধরত শত্রুকে নিরাপত্তা দিতে আদেশ দেয়া হয়েছে ইসলামী সরকার ও সমাজকে। শুধু তাই নয়! আশ্রিত শত্রুকে তার চাহিদা মত নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। মানবতার প্রতি এত দয়া, মানবাধিকারের এত সুন্দর বাণী ইসলাম ছাড়া আর কে দিতে পারবে?

বর্তমান বিশ্বে কোনো ভিনদেশীকে আশ্রয় দেয়ার নাম স্পন্সারশীপ বা কিফালাহ। ইসলামী বিধান মতে স্পন্সার দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে প্রতিটি নাগরিকের। কিন্তু আজকাল দেশে দেশে এ নাগরিক অধিকার হরন করা হচ্ছে। আজকাল দেশের সকল নাগরিক স্পন্সার করতে পারে না। আর অনেক দেশেই এ নাগরিক অধিকার শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ এবং ধনীদের জন্য সংরক্ষিত।

একটি ঘোষনাঃ ইসলামী আইন শাস্ত্রের তথা ফিক্বহের ক্লাসিক প্রায় সকল কিতাবেই ইসলামী দেশে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইন শা-আল্লাহ আমাদের অধিকার বইয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৬. কাফির মুশরিকদের স্বভাব

ইসলামের মূল বিষয় আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও অনুকরণ; তাই স্বভাবজাত কারনেই মুসলিমরা নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, সহনশীল ও পরোপকারী হয়ে থাকে। আর কাফিররা যেহেতু আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য; তাই তাদের স্বভাবে থাকে; দম্ভ, অহমিকা, স্বার্থপরতা, শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ, চাটুকারীতা, পরশ্রিকাতরতা, ইত্যাদি। কাফিরদের বেশকিছু মন্দ স্বভাবের কথা আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। বুঝার সুবিধার্থে এখান থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হল..

স্বভাবঃ ১. দম্ভ ও অহমিকাঃ কাফিররা দাম্ভিক, অহংকারী, অন্যায়কারী, অবিচারী ও অত্যাচারী হয়ে থাকে। সকল কাফিরের মাঝে এসব বদ-সভাব পাওয়া গেলেও সাধারনত নেতা, ধনী ও প্রভাবশালী কাফিরদের মাঝে বেশী পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41)

যারা আমার আয়াত (কিতাব, বিধান, নিদর্শন) এর সাথে কুফর করে তথা দম্ভ করে (হাশরের বিচারের পর) তাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। (সকল জান্নাতই ১ম আকাশের উপরে, ১ম আকাশ পাড়ি দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে। যেহেতু তাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না) তাই তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা সম্ভব হলেও (তাদের জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে)

না। (কারণ তারা পাপিষ্ঠ জালিম) আর জালিমদের (পাপিষ্ঠদের, অন্যায়কারীদের, অবিচারকারীদের, অত্যাচারকারীদের) বদলা আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি। তাদের নীচে থাকবে আগুনের আবরণ, উপর থেকেও আগুন তাদের আচ্ছাদন করে থাকবে। আর জালিমদের বদলা আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি। (৭ আ'রাফঃ ৪০-৪১)

জ্ঞাতব্যঃ হাশরের মাঠ হবে আমাদের এ দুনিয়া। জান্নাত আকাশের উপরে আর জাহান্নাম আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে। জান্নাতে যেতে হলে আকাশ পার হয়ে যেতে হবে। তাই যাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না তারা জান্নাতে যেতে পারবে না বরং তারা জাহান্নামেই নিক্ষিপ্ত হবে।

বিশেষ হুশিয়ারিঃ উল্লেখিত কাজটি যেহেতু কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তাই এটি অবশ্যই কুফর। সুতরাং কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক।

স্বভাবঃ ২. সত্য গোপন করাঃ সত্য গোপন তথা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের তথ্য গোপন কাফিরদের অন্যতম বদ-স্বভাব। সাধারনত দলবাজ শিক্ষিত কাফিরদের মাঝে এসব বদ-স্বভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174)

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব থেকে কোনোকিছু গোপন করবে অথবা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে বদলে ফেলবে, তারা আগুন দিয়েই উদর পূর্তি করছে। পরকালে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ-মুক্ত) করবেন না। তাদের তরে অবধারিত আছে কঠিন আযাব। (২ বাক্বারাহঃ ১৭৪)

জ্ঞাতব্যঃ অমুসলিম কাফির আর মুনাফিক কাফির; উভয় প্রকার কাফিরের মাঝেই এ বদ-স্বভাবটি বিদ্যমান থাকে।

স্বভাবঃ ৩. অবাধ্যতা, সীমালংঘন ও পাপাচারঃ অবাধ্যতা, সীমা লঙ্ঘন ও পাপাচার কাফিরদের অন্যতম কয়েকটি বদ-স্বভাব। সাধারনত সকল কাফিরের মাঝেই এসব বদ-স্বভাব পরিলক্ষিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14)

তুমি কী দেখনি, তোমার রাব্ব আ'দ (জাতি)র সাথে কেমন করেছেন? যারা ছিল সুঠাম দেহী ইরাম (জাতির অংশ। সাহীহ মতে তাদের সাধারণ উচ্চতা ছিল ১২ গজ, কোনো কালে) কোনো দেশেই যাদের মত করে অন্য কাউকে সৃষ্টি করা হয়নি। আর (স্মরণ কর! কী হয়েছে) ছামূদ (জাতি)র সাথে, যারা পাহাড়ী উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর বানাত? আর (কী হয়েছে) বিশাল বাহিনীর অধিকারী ফেরাউনের সাথে? যারা (উল্লেখিত জাতিসমূহ) দেশে দেশে **অবাধ্যতা /সীমালঙ্ঘন** করেছে, অনেক অনেক **ফাসাদ** (পাপাচার) করেছে, যে কারণে প্রভু তার আযাবের লাঠি তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু অবশ্যই সঠিক অবস্থানে রয়েছেন। (৮৯ বুরুজঃ ৬-১৪)

বিশেষ হুশিয়ারিঃ উল্লেখিত কাজটি যেহেতু কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তাই আল্লাহর বিধানের সাথে অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন কুফরেরই নামান্তর। সুতরাং কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

স্বভাবঃ ৪. প্রপাগান্ডা ও মিথ্যাচারঃ কাফিরদের আরো একটি বদ-স্বভাব হচ্ছে প্রপাগান্ডা ও মিথ্যাচার। নীতিবান, আদর্শবান ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডা করা এবং এসব করে জনতাকে বিভ্রান্ত করা কাফিরদের একটি চিরাচরিত বদ-স্বভাব। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ (25)

(নূহ রাসূল হয়ে আসার পর) জাতির কাফির নেতারা (জনতাকে) বললঃ সে আসলে তোমাদের মতই মানুষ, (নবুয়তের অজুহাতে) তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। (সে আসলে নবী বা রাসূল কিছুই নয়। কারন) আল্লাহ যদি (রাসূল পাঠাতে) চাইতেন তবে অবশ্যই কোনো ফিরিস্তাকে পাঠাতেন। (কোনো মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল হয়ে আসে) এমন কথা কখনো পূর্বসূরিদের থেকে শুনিনি। (তারা আরো বলল) ওই ব্যক্তি উন্মাদ। কিছু কাল অপেক্ষা কর (তার আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে) (২৩ মুমিনূনঃ ২৪)

বিশেষ হুশিয়ারিঃ উল্লেখিত কাজটি যেহেতু কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তাই আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের বিরোদ্ধে প্রপাগান্ডা ও মিথ্যাচার অবশ্যই কুফর তথা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। সুতরাং কোনো মুসলিম এমন করলে সে চির-জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

স্বভাবঃ ৫. চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রঃ কাফিরদের আরো একটি বদ-স্বভাব; চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। নিজেদের প্রভাব, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, অর্থ, সম্পদ ও পদবীর জন্য চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করা কাফিরদের চিরাচরিত স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছে..

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ (60) قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ (61) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ (62) قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ (64)

ফেরাউন প্রস্থান করল, চক্রান্ত পাকাপুক্ত করে ফিরে এল (সারা বিশ্ব থেকে বাছা বাছা যাদুকর এনে জমা করল) মূসা বললঃ তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করো না, তিনি আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে

দেবেন। কারণ আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারীর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়। তারা (ফেরাউন পরিষদ) বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল, গোপন বৈঠক করল। তারা (জনতাকে) বললঃ (মূসা ও হারুন) দুজন যাদুকর তাদের যাদু দিয়ে তোমাদেরকে দেশ ছাড়া করতে চায়, তোমাদের সুন্দর জীবন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। সুতরাং তোমরাও করণীয় ঠিক কর, সুসংহতভাবে এদের মোকাবিলা কর। আজ যে বিজয়ী হতে পারবে সেই চূড়ান্ত বিজয়ী হবে। (২০ ত্বাহাঃ ৬০-৬৪)

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22)

নূহ বললঃ হে রাব্ব! তারা (জনতা) আমার অবাধ্য হয়ে গেছে এবং এমন লোকের আনুগত্য করছে যার সন্তান ও সম্পদ তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা বারবার বড় বড় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করছে। (৭১ নূহঃ ২১-২২)

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ	তারা ষড়যন্ত্র করেছে, আল্লাহও কৌশল ঠিক করেছেন, আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী। (৩/৫৪)

স্বভাবঃ ৬. আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়াঃ দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া কাফিরদের আরো একটি বদ-স্বভাব। কাফিররা দুনিয়াকে দ্বীন ও আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসে। ফলে তারা দ্বীন এবং আখেরাতের ব্যাপারে গাফিল থেকে যায়। এ ব্যাপা নাযিল হয়েছে..

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (108) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (109)

(তাদের তরে জাহান্নাম নির্ধারিত হওয়ার) কারণঃ তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসে (কাফির হয়ে গেছে) আর আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে। অধিক পাপের কারণে) আল্লাহ এদের অন্তরে, কানে ও চোখে মোহর লাগিয়ে দেন। ফলে এরা গাফিল হয়ে যায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আখেরাতে এরা (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (১৬ নাহ'লঃ ১০৭-১০৯)

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (17)	বস্তুত তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক, অথচ আখেরাতই উত্তম এবং চিরস্থায়ী। (৮৭ আ'লাঃ ১৬-১৭)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আমাদের সমাজে অনেকেই দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং দুনিয়াকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসে। দুনিয়ার স্বার্থ এবং আখেরাতের স্বার্থ একত্রিত হলে তারা দুনিয়াকেই প্রাধান্য দেয়। আসলে এমন করা কুফর। যারা এমন করে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়। ফলে তারা আর সৎপথ খোঁজে পায় না।

স্বভাবঃ ৭. মনগড়া পথে চলাঃ কাফিরদের আরো একটি স্বভাব হল আল্লাহর দেওয়া নীতি-আদর্শ ও বিধিবিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত ও মনগড়া পথে চলা। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36)

আসলে তাদের অধিকাংশই "যান্ন" (ধারণা, খেয়ালখুশী, মনগড়া, মানবরচিত নীতি, আদর্শ ও বিধিবিধান) এর অনুকরণ করছে। আর "যান্ন" কখনো সত্যের বিকল্প হতে পারে না। তারা যা করছে এ সব ব্যাপারে আল্লাহ অবগত। (১০ ইউনুসঃ ৩৬)

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50)

(হে নবী!) তারা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয় তবে মনে করবেঃ তারা "হাওয়া" মেনে চলছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নীতি বাদ দিয়ে "হাওয়া" (মনগড়া নীতি, আদর্শ, মতবাদ, বিধান) মেনে চলে তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না। (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে) (২৮ ক্বিস্বাস্বঃ ৫০)

হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া, মানব রচিত, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে, যতকিছু আছে এসবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"। মানুষ নানা ভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন..

- অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে। এসবই হাওয়ার অনুকরণ।
- অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া মসলক, মিনহাজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। বিভক্তি বা বিভাজনের পর্যায়ে চলে গেলে এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ হিসেবেই গন্য হবে।
- অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- এভাবে নানা জনে নানা পদ্ধতিতে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। (হাওয়া সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ নিসাঃ ১৩৫, আ'রাফঃ ১৭৬, জাছিয়াহঃ ২৩)

স্বভাবঃ ৮. ইসলামি বিধানকে হেও প্রতিপন্ন করাঃ কাফিরদের আরো একটি স্বভাব হল ইসলাম ও ইসলামী বিধিবিধানকে সেকেলে মনে করা এবং পুরানো দিনের রূপকথা বলে হেও প্রতিপন্ন করা। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31)

পটভূমিঃ নাদ্বার বিন হারিছ মক্কার একজন শিক্ষিত চৌকস পুরুষ। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো এবং বই পড়া তার সখ। সে নানা স্থান ভ্রমণ করত, নানা ধরনের বই কিনে আনত এবং লোকজনকে গল্প শোনাত। কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতায় প্রথম দিকে যেসব আয়াত নাযিল হল এর অধিকাংশ-ই ছিল ঐতিহাসিক নানা ঘটনা। তাই নাদ্বার বললঃ এসব ঘটনা আমার জানা আছে। আমি চাইলে এসব বলতে পারি। (অন্যরা নাদ্বরের কথায় সমর্থন দিত) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

তাদের সামনে যখন আল্লাহর কিতাব পাঠ করা হয় তখন তারা বলেঃ আমরা এসব শুনেছি, চাইলে আমরাও এমন বলতে পারব। এসব আগেকার রূপকথা বৈ কিছুই নয়। (৮ আনফালঃ ৩১)

..কাফিররা বলে "এটা আগেকার রূপকথা ছাড়া কিছুই নয়"। (আনয়ামঃ ২৫)	يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25)

স্বভাবঃ ৯. দ্বীনি কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করাঃ কাফিরদের আরো একটি বদ-স্বভাব হল আল্লাহর দ্বীন কায়েম, দ্বীনের দাওয়াত, দ্বীনি শিক্ষা ও দ্বীন মেনে চলতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি কতা, বাধার সৃষ্টি করা। ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1)

যারা কুফর করে এবং আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাদের সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। (৪৭ মুহাম্মাদঃ ১)

জ্ঞাতব্যঃ অনেক মানুষ নিজেকে মুসলিম মনে করে, নামায রোজাসহ কিছু ইবাদাতও পালন করে। তবে দ্বীন কায়েম ও দ্বীন পালনের পথে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করে, প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে যা কুফরেরই নামান্তর। এ কাজটি বেশী করে আমাদের সমাজের..

- এক শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা, (সাধারণত তারা এ কাজটি করে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য)
- এক শ্রেণীর গ্রাম্য মোড়ল (তারা একাজটি করে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য)
- এক শ্রেণীর হুজুর। (তারা একাজটি করেন নিজেদের দলীয় মতাদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য এবং নিজেদের বলয় ধরে বাখার জন্য)

যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। আখেরাতে জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়। তারা হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

স্বভাবঃ ১০. মুঅমিনদের নিয়ে উপহাস করাঃ কাফিরদের আরো একটি বদ-স্বভাব হল মুসলিমদের নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা ও উপহাস করা। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)

যারা পাপিষ্ঠ কেবল তারাই মুঅমিনদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা ও উপহাস করে, মুঅমিনদের অতিক্রমকালে চোখ টিপে কটাক্ষ করে, অতঃপর আনন্দচিত্তে আপন লোকদের কাছে ফিরে যায়, মুঅমিনদেরকে দেখলে বলেঃ "এরা অবশ্যই বিভ্রান্ত"। অথচ তাদেরকে এদের জিম্মাদার বানিয়ে পাঠানো হয়নি।

আজকের এদিনে (পরকালে) মুঅমিনগণ কাফিরদেরকে নিয়ে উপহাস করবে, সুসজ্জিত আসনে বসে (তাদের আযাব) প্রত্যক্ষ করবে। কী.., কাফিরদেরকে তাদের অপকর্মের যথাযথ বদলা দেয়া হয়েছে তো? (৮৩ মুত্বাফফিফীনঃ ২৯-৩৬)

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106)

এটাই জাহান্নাম, তাদের কর্মফল, কারণ তারা কুফর করেছে, আমার আয়াত ও রাসূলগণকে নিয়ে উপহাস করেছে। (১৮ কাহাফঃ ১০৬)

স্বভাবঃ ১১. প্রশ্ন উত্থাপন করাঃ কাফিরদের আরো একটি বদ-স্বভাব হল ইসলাম, মুসলিম ও কুরআনের উপর নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে ইসলামী বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32)

যারা কুফর করে তারা বলেঃ কুরআন কেন এক সাথে নাযিল হলো না (এ প্রশ্নের জবাবে মহান আল্লাহ বলছেন আমি এ কুরআনকে) এভাবে ধীরে ধীরে নাযিল করেছি তোমার অন্তরকে সুসংহত করার জন্য। (২৫ নামলঃ ৩২)

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94)

তারা (কাফির মুশরিকরা) বললঃ (মুহাম্মাদ!) আমরা তোমাকে মেনে নেব না, যতক্ষন না..

- (মক্কার) যমীনে ঝর্ণা প্রবাহিত করবে।
- অথবা তোমার নিজের জন্য তৈরি করবে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, যার ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত হবে নহর
- অথবা (তোমাকে না মানার কারণে) আকাশ ভেঙ্গে আমাদের উপর ফেলে দেবে, যেমনটি তুমি মনে কর (তোমাকে না মানলে আযাবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।)
- অথবা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ ও ফিরিস্তা এনে হাজির করবে।
- অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি করবে বা আকাশে আরোহণ করবে। আর তোমার আকাশে আরোহণও বিশ্বাস করব না যতক্ষন না আমাদের জন্য পাঠযোগ্য (পরিপূর্ণ) কিতাব নিয়ে আসবে।

(হে নবী! তাদের) বলে দাওঃ আমার প্রভু মহান (তিনি যা খুশী তাই করেন/করতে পারেন। কিন্তু আমি মুহাম্মাদ কিছুই করতে পারি না। কারণ) "আমি একজন মানুষ ও রাসূল বৈ কিছুই নয়"। মানুষের কাছে হুদা (আল-কুরআন) আসা সত্ত্বেও তারা ঈমান না আনার কারণ হলঃ (তারা মনে করে আল্লাহ কোনো মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠান না। তাই এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে) তারা বলেঃ "আল্লাহ কী মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠালেন"? (১৭ ইসরাঃ ৯০-৯৪)

জ্ঞাতব্যঃ যারা রাসূলকে মানুষ হিসেবে মেনে নিতে পারে না তারা হেদায়াত থেকে দূরে সরে যায়। আসলে সকল রাসূলই মানুষ ছিলেন। তবে রাসূল হিসেবে তাদের মান মর্যাদা ছিল অনেক উপরে, অনেক বেশী।

স্বভাবঃ ১২. হুমকি ধমকি দেওয়াঃ কাফিরদের আরো একটি স্বভাব হল তারা নিজেরা অন্যায় ও পাপাচার করবে কিন্তু যে বা যারা এসব অন্যায় কাজে বাধা হয়ে দাড়াবে তাদেরকে হুমকি ধমকি দেবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13)

কাফিররা রাসূলদেরকে বলেছেঃ আমাদের মতাদর্শে ফিরে আসো, নতুবা তোমাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। প্রভু তখন রাসূলদের কাছে ওহী পাঠিয়েছেনঃ (চিন্তা করো না) নিশ্চয় আমরা পাপিষ্ঠদের ধ্বংস করে দেব। (১৪ ইবরাহীমঃ ১৩)

স্বভাবঃ ১৩. কাফিরদের আরো একটি বদ-স্বভাব হল তারা ত্বাগূতের পথে যুদ্ধ করে। ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)

যারা ঈমান আনে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কুফর করে তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূ'তের পথে। সুতরাং (হে আমার বান্দারা!) তোমরা শয়তানের আওলিয়াদের (মিত্রদের) সাথে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল। (৪ নিসাঃ ৭৬) (আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও শক্তিকে ত্বাগূ'ত বলা হয়। আর সকল ত্বাগূতই শয়তানের মিত্র হিসেবে কাজ করে।)

পর্যালোচনাঃ আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য কাফিরদের অনেকগুলো বদ-স্বভাব থেকে আমরা মাত্র ১৩টি বদ-স্বভাবের কথা আলোচনা করেছি। আল-কুরআনে তাদের আরো অনেক বদ-স্বভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বদ-স্বভাব সম্পর্কে জানা এবং এসব থেকে বেচে থাকা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। সুতরাং আসুন! আল-কুরআন অধ্যয়ন করি, কাফির মুশরিকদের যাবতীয় বদ-স্বভাব থেকে বেচে থাকি এবং আল্লাহর পথে চলি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওফীক্ব দান কর। আ-মীন!!

অনুচ্ছেদঃ ৭. কাফিরদের দম্ভোক্তি

কাফির ব্যক্তি যেহেতু দাম্ভিক, অহংকারী, মিথ্যুক, প্রপাগান্ডাকারী ও চক্রান্ত প্রিয় হয়ে থাকে। তাই দম্ভ ও দম্ভোক্তি এদের স্বভাবজাত অভ্যাস। এদের অনেক দম্ভোক্তির কথা আল-কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টিকে ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য আল-কুরআন থেকে এদের কিছু দম্ভোক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হল..

দম্ভোক্তিঃ ১. আমিই উত্তমঃ কাফিরদের আসল গুরু ইবলিস। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দম্ভোক্তিটি ইবলিস থেকেই পাওয়া যায়। ইবলিস আল্লাহর আদেশ পালন করে আদম আ.-কে সিজদাহ করেনি। মহান আল্লাহ এর কৈফিয়ত চাইলে ইবলিস দম্ভ করে বলেছিল..

"আমি তার থেকে উত্তম। আপনি আমাকে বানিয়েছেন আগুন দিয়ে আর তাকে মাটি দিয়ে" (৭ আ'রাফঃ ১২)	**قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ**

আসলে সৃষ্টিগতভাবে বা বংশগতভাবে কেউ কারো থেকে মহত বা উত্তম নয়, বয়সে বড় হলেই কেউ কারো থেকে শ্রেষ্ট হয়ে যায় না। মানুষের মহত্ব ও শেষ্টত্বের মূল বিষয়ঃ আল্লাহর তাওকয়া। আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন "..তোমাদের যার তাকওয়া যতবেশী; আল্লাহর কাছে সে-ই সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান"। (৪৯ হুজরাতঃ ১৩)

দম্ভোক্তিঃ ২. তোমাকে মেরে ফেলবঃ মানব ইতিহাসে সর্ব প্রথম দম্ভ ও অহমিকার পরিচয় দিয়েছিল কাবিল। তার দম্ভোক্তি ছিল "আমি তোমাকে মেরে ফেলব"। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27)

(হে নবী!) তাদের কাছে আদমের দুই ছেলের (হাবিল ও কাবিলের) কাহিনী বর্ণনা কর। যখন তারা উভয়ে (আল্লাহর নামে) কুরবানী করল, তখন একজনের (হাবিলের কুরবানী) কবুল হল আর অন্যজনের (কাবিলের) কবুল করা হল না। (কাবিল রেগে গিয়ে হাবিলকে) বললঃ "আমি তোমাকে মেরে ফেলব"। (হাবিল) বললঃ (তুমি পাপ ছেড়ে ভালো হয়ে যাও। তখন তোমার কুরবানীও কবুল হবে। কারণ) আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের থেকেই (তাদের ঈমান ও আ'মাল) কবুল করে থাকেন। (৫ মাইদাহঃ ২৭)

তাকওয়া ও মুত্তাকী পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে আরবী তাক্বওয়া থেকে। আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা। ইসলামী পরিভাষায় যাবতীয় কুফর শিরক ও মহাপাপ থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করল তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা..

অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হল সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতেই হবে। নতুবা তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে। আর এতোটুকু তাকওয়া না থাকলে কারো ঈমান ও আ'মাল কিছুই কবুল করা হয় না।

আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুঅমিনের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হল সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এমন তাওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর নীতি হলঃ তিনি শুধু মুত্তাক্বীদের ইবাদাতই কবুল করেন। বান্দার ঈমান, আ'মাল ও ইবাদাত কবুল হতে হলে কুফর শিরক থেকে বেচে থাকতেই হবে। কারণঃ যে ব্যক্তি কুফর বা শিরকে জড়িয়ে মুনাফিক হয়ে যায়; আল্লাহ্ তার কিছুই কবুল করেন না।

দম্ভোক্তিঃ ৩. অমুক বাচাবেঃ মানব ইতিহাসে আরো একটি দম্ভোক্তি করেছিল নূহ আ.-র ছেলে কিনান। তখন বন্যা আকারে এসেছিল আল্লাহর আযাব। বানের পানিতে ডুবতে ডুবতে সে দম্ভ করে বলেছিল "আমি পাহাড়ে চলে যাচ্ছি, পাহাড় আমাকে পানি থেকে বাচাবে"। ইরশাদ হচ্ছে..

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43)

জাহাজটি তাদের নিয়ে পাহাড়সম ঢেউয়ের মাঝে ভেসে চলল। ছেলেকে বিচ্ছিন্নভাবে ডুবতে দেখে নূহ ডেকে বললঃ বৎস! কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলে আসো। ছেলে বললঃ "পাহাড়ে চলে যাচ্ছি, পাহাড় পানি থেকে বাঁচাবে"। নূহ বললঃ এ আযাব থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া। এমন সময় ঢেউ এসে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিল। (নূহের) ছেলে ডুবে গেল। (১১ হূদঃ ৪২-৪৩)

জ্ঞাতব্যঃ নিজের ঈমান না থাকলে আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে যায়। তখন কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। এমন কি নবী রাসূল ও নিজের ছেলেমেয়ে স্ত্রী বা পরিবারকে বাঁচাতে পারেন না। সুতরাং আসুন! আত্মপ্রতারণা না করে সবাই সঠিক পথ ধরি।

দম্ভোক্তিঃ ৪. আমি সব পারিঃ আরেকটি দম্ভোক্তি করেছিল ইরাকের রাজা নমরুদ। ইবরাহীম আ. যখন বলেছিলেন "আল্লাহ জীবন মৃত্যুর মালিক"। সে তখন দুই ব্যক্তিকে ডেকে এনে একজনকে হত্যা করেছিল আর অন্যজনকে ছেড়ে দিয়ে দম্ভ করে বলেছিল "আমিও জীবন দিতে পারি, মৃত্যু দিতে পারি"। তার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ(258)

তাকে (নমরূদকে) দেখনি? আল্লাহ তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন বলে সে রাব্ব নিয়ে ইবরাহীমের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। যখন ইবরাহীম বললঃ আমার রাব্ব জীবন দেন, মৃত্যু দেন। সে (দুই ব্যক্তিকে ডেকে এনে একজনকে হত্যা করল আর এক জনকে ছেড়ে দিল। -কুরতুবী। তারপর) বললঃ (দেখলে তো) আমিও জীবন দিতে পারি, মৃত্যু দিতে পারি। ইবরাহীম বললঃ (আমার রাব্ব) আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদয় করেন, তুমি (পারলে) পশ্চিম থেকে উদয় করাও। কাফির তখন হতবাক হয়ে গেল। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে না চায়) (২ বাক্বারাহঃ ২৫৮)

জ্ঞাতব্যঃ যারা নাস্তিক, যারা কাফির বা মুশরিক, যারা কুরআন বুঝে না, হাদীছ মানে না, তাদের সাথে তর্ক বা আলোচনা করতে হয় লজিক দিয়ে, যুক্তি দেখিয়ে এবং যুক্তির মাধ্যমেই তাদের হতবাক করে দিতে হয়।

দম্ভোক্তিঃ ৫. আমার কথাই আইনঃ মানব ইতিহাসে আরো একটি মহা দম্ভোক্তি করেছিল মিশরের রাজা ফেরাউন। ক্ষমতার উন্মাদনায় মত্ত হয়ে সে দম্ভ করে বলেছিল "আমি তোমাদের মহান রাব্ব"। তার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

সে লোক জমা করে ঘোষণা দিলঃ আমিই তোমাদের মহান রাব্ব। (৭৯/২৩-২৪)	فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

দম্ভোক্তিঃ ৬. আল্লাহকে হেও করাঃ অনেকগুলো দম্ভোক্তি করেছে ইয়াহুদ উলামা সমাজ। তাদের একটি দম্ভোক্তি ছিল "আমরা ধনী আর আল্লাহ গরীব"। তাই তিনি আমাদের কাছে ঋন চেয়েছেন। নাযিল হয়েছে..

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181)

পটভূমিঃ যখন নাযিল হল "কে আছো? আল্লাহকে ঋণ দেবে? উত্তম ঋণ। আল্লাহ তাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবেন"। (২/২৪৫) তখন ইয়াহুদ নেতা হুয়াই বিন আখত্বাব (রাসূল সাঃর স্ত্রী স্বাফিয়্যাহ বিনত হুয়াই এর পিতা)সহ কয়েকজন ইয়াহুদ (মশকারা করে) বললঃ "আল্লাহ্ ফকীর আর আমরা ধনী" তাই তো তিনি আমাদের থেকে ঋণ চেয়েছেন। (কুরতুবী) তাদের এ দম্ভোক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

আল্লাহ্ তাদের কথা শুনেছেন; যারা বলেছেঃ "আল্লাহ ফকীর আর আমরা ধনী"। তাদের এসব কথা আমরা লিখে রাখছি। আর অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার বিষয়টিও (ভুলে যাইনি, এর পরিণতিতে পরকালে তাদেরকে) বলা হবেঃ জ্বলন্ত আযাব আস্বাদন কর, এটা-ই তোমাদের কর্মফল। আল্লাহ বান্দার উপর অবিচার করেন না। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৮১)

দম্ভোক্তিঃ ৭. আমাদের অন্তর আবৃতঃ ইয়াহুদ উলামাদের আরো একটি দম্ভোক্তি ছিল "আমাদের অন্তর আবৃত"। তাই তোমার কথা আমাদের হৃদয়ে ঢুকবে না। নাযিল হয়েছে..

তারা (ইয়াহুদ উলামা) বলেঃ আমাদের অন্তর আবৃত (তাই তোমার কথা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না।) আসলে কুফরের কারণে আল্লাহই তাদের লা'নত করেছেন। ফলে ঈমান তারা কমই আনবে। (২/৮৮)	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ

দম্ভোক্তিঃ ৮. এরা ধর্মান্ধঃ কাফিরদের আরো একটি দম্ভোক্তি হল তারা মুঅমিনদেরকে নির্বোধ, মিথ্যুক ও ধর্মান্ধ বলে আখ্যায়িত করে। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (66)

জাতির কাফির নেতারা বললঃ তুমি দেখছি পুরাই নির্বোধ। আমরা মনে করি তুমি মিথ্যুক। (৭ আ'রাফঃ ৬৬)

দম্ভোক্তিঃ ৯. আযাব নিয়ে আসোঃ কাফিররা আল্লাহর আযাব নিয়েও দম্ভোক্তি করে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32)

পটভূমিঃ মক্কার মুশরিকরা মনে করত তারাই ধার্মিক আর মুহাম্মাদ ও তার আনুসারীরা ধর্মের নামে অথর্ব সৃষ্টিকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভ্রান্ত। তারা এ বিশ্বাসের উপর অবিচল ছিল। তাই মুহাম্মাদ সাঃ-র আনীত বিধানকে বিভ্রান্তি হিসেবে চিহ্নিত করে জনসম্মুখে উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

আর (স্মরণ কর!) যখন তারা বলেছিলঃ হে আল্লাহ! (মুহাম্মাদ যা বলছে) এটাই যদি তোমার পক্ষ থেকে আগত সঠিক হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর শিলা নিক্ষেপ কর, অথবা নাযিল কর কোনো কঠিন আযাব। (৮ আনফালঃ ৩২)

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77)

তারা আল্লাহর উটনীকে কেটে ফেলল, প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করল এবং বললঃ স্বালিহ! তুমি সত্য রাসূল হলে (আযাবের ব্যাপারে) তোমার প্রতিশ্রুতি বস্তবায়ন কর। (৭ আ'রাফঃ ৭৭)

দম্ভোক্তিঃ ১০. এরা নির্বোধঃ কাফিরদের আরো একটি দম্ভোক্তি হল তারা মনে করে তারা বড়ই বুদ্ধিমান। আর যে বা যারা দ্বীনের পথে চলে তারা বিকারগ্রস্থ, নির্বোধ। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48)

(হে নবী) আমি জানিঃ তারা কখন/কেন লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনে। পাপিষ্ঠরা (তোমার থেকে কুরআন শুনে আর) পরস্পরে একান্ত সাক্ষাতে বলেঃ (মুহাম্মাদ উন্মাদ হয়ে গেছে।) তোমরা কী এক কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদের অনুকরণ করবে। লক্ষ্য করঃ তারা কীভাবে তোমাকে উপস্থাপন করে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে? পরে আর পথ খুঁজে পাবে না। (১৭ ইসরাঃ ৪৭-৪৮)

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের সূচনাতে কাফির নেতারা লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শোনত। কারণ ১ম দিকের অধিকাংশ সূরাতেই আগেকার জাতিসমূহের ইতিহাস ও ঘটনা সম্বলিত আয়াত বেশী নাযিল হয়েছে। আর এসব ঘটনা বর্ণনায় আল-কুরআনের বাচনভঙ্গি, বর্ণনা পদ্ধতি ও শব্দ বিন্যাস ছিল অতুলনীয়।

পর্যালোচনাঃ কাফিররা নানাভাবে দম্ভোক্তি করে থাকে। তাদের অনেক দম্ভোক্তির কথা আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা মাত্র ১০টি এখানে আলোচনা করেছি। এসব দম্ভোক্তি সম্পর্কে জানা এবং এসব থেকে বেচে থাকা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। সুতরাং আসুন! আল-কুরআন অধ্যয়ন করি, কাফির মুশরিকদের যাবতীয় বদ-স্বভাব ও দম্ভোক্তি থেকে বেচে থাকি এবং আল্লাহর পথে চলি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওফীক্ব দান কর। আ-মীন!!

অনুচ্ছেদঃ ৮. কাফির মুশরিকদের কামনা

কাফিররা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তাই তারা চায়; সবাই তাদের মত পাপিষ্ঠ, অবাধ্য ও কাফির হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাক। শয়তান তাদের এ চাওয়াকে শোভিত করে দেয়, তাদেরকে প্ররোচনা দেয় এবং সাহায্য সহযোগিতা করে। কাফিরদের এমন চাওয়া ও শয়তানের প্ররোচনার ব্যাপারে আল-কুরআনের অনেক জায়গায় আলোচনা হয়েছে। এসব আয়াত থেকে কয়েকটিমাত্র নিম্নে উল্লেখ করা হল..

কামনাঃ ১. কাফিররা চায়; আমরা সবাই তাদের মত পাপিষ্ঠ কাফির হয়ে যাই। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

তারা চায়; যেন তোমরাও কুফর কর যেমন তারা কুফর করছে, যেন তোমরা ও তারা একাকার হয়ে যাও। (৪ নিসাঃ ৮৯)	وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

কামনাঃ ২. কাফিররা কামনা করে যেন আমরা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ থেকে গাফিল থাকি, যেন তাদের সামরিক শ্রেষ্টত্ব বজায় থাকে আর তারা ইচ্ছামত আঘাত করে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

..কাফিররা চায় তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র থেকে গাফিল থাকো যেন তারা অতর্কিত হামলা করে.. (সব ধ্বংস করে দিতে পারে।) (৪ নিসাঃ ১০২)

কামনাঃ ৩. কাফিররা চায় যেন আমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে যাই। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69)

(হে মুসলিমগণ! সাবধান থেকো। কারণ) আহলে কিতাবের অনেকেই একান্তভাবে চায়; যদি তোমাদেরকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করতে পারতো। আসলে (এমন করে) তারা নিজেদের বিভ্রান্তিই বাড়াচ্ছে। কিন্তু এ অনুভুতিও তাদের নেই। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৬৯)

কামনাঃ ৪. কাফিররা আমাদেরকে কুফরে ফিরিয়ে নিতে চায়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)

(হে মুঅমিনগণ! শোনো!) আহলে কিতাবের অনেকেই একান্তভাবে কামনা করে "ঈমান আনার পর তোমাদেরকে যদি আবার কুফরে ফিরিয়ে নিতে পারতো"। সঠিক বিষয় (ইসলামের সত্যতা) তাদের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা এমনটি করে শুধুমাত্র প্রতিহিংসার কারণে। তবে তোমরা (এতে বিচলিত না হয়ে) ক্ষমা করবে, উপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ (এ ব্যাপারে) কোনো আদেশ জারি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (২ বাক্বারাহঃ ১০৯)

জ্ঞাতব্যঃ হিংসা পতনের মূল। হিংসা ইবলিসকে শয়তান বানিয়েছে। আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদ ও নাসারা সুস্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ সা.কে চিনতে পেরেছিল কিন্তু শুধু প্রতিহিংসার কারণে মেনে নিতে পারেনি, তার প্রতি ঈমান আনতে পারেনি। আজকালও আমাদের দলবাজদের একই অবস্থা। তারাও অনেক ক্ষেত্রে সত্য কথা এবং সঠিক বিষয় বুঝতে পারে কিন্তু হিংসা বশত মানতে পারে না।

পর্যালোচনাঃ কাফিররা আরো অনেক কিছুই চায়। তাদের কামনা-বাসনার অনেক কথাই আল-কুরআনে আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপ করার জন্য নমুনা স্বরূপ মাত্র ৪টি কামনার কথা উল্লেখ করা হল। আল-কুরআন অধ্যয়ন করলে আরো অনেক কিছুই জানতে পারবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৯. কাফির মুশরিকদের আদর্শিক অনুকরনের প্রভাব

কাফির মুশরিকদের আদর্শিক অনুকরণ বিভ্রান্তির অন্যতম পথ, নীতিগত ও আদর্শগতভাবে কাফিরদের আনুগত্য ও আনুকরন মেনে নিলে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা যদি (আদর্শগতভাবে) কাফিরদের আনুগত্য মেনে নেও তবে তারা তোমাদেরকে পূর্বাবস্থায় (কুফরে) ফিরিয়ে নেবে, আর তখন তোমরা (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৪৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা যদি আহলে কিতাবের কারো আনুগত্য মেনে নাও তবে তারা (তোমাদের মাঝে পরস্পরে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে এবং) ঈমানের পর তোমাদেরকে আবার কুফরে ফিরিয়ে নেবে। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১০০)

পর্যালোচনাঃ আজকাল আমাদের অবস্থা তাই হয়েছে। আমাদের অনেক দেশ, অনেক সংঘোঠন এবং অনেক ব্যক্তি নীতিগতভাবে কাফির, মুশরিক ও বনী-ইসরাঈলের অনুকরন করে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে ধ্বংসের দ্বার-প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। যার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী আমরা নিজেরাই।

অনুচ্ছেদঃ ১০. কাফিরদের শ্রেণী বিন্যাস

কাফিরদেরকে মোট ৭টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন..

- সাধারণ কাফিরঃ যে কাফির ইসলাম গ্রহন করেনি। (বিধানগতভাবে এরা আবার হারবী, যিম্মী ও আমনী; এ তিন ভাগে বিভক্ত)
- নাস্তিক কাফিরঃ যে কাফির সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করে না, সে মনে করে সবকিছু প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি এবং প্রকৃতিই মহান স্রষ্টা।
- মুশরিক কাফিরঃ যে কাফির মুর্তীপূজা করে বা অন্য কোনোভাবে আল্লাহর শরীক, সমান বা সমকক্ষ বানায়।
- কিতাবী কাফিরঃ ইয়াহুদ বা খৃষ্টান কাফির। (দেখুন সূরাহ আল-বায়্যিনাহঃ ৬, কিছু ব্যাপারে এদের বিধান অন্য কাফির থেকে আলাদা)
- মুসলিম কাফির বা মুনাফিক কাফিরঃ যে ব্যক্তি বাহ্যত ইসলাম গ্রহন করেছে এবং বাস্তব জীবনের কিছু বিষয়ে ইসলামী বিধান মেনেও চলে তবে কোনো না কোনোভাবে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়েছে; ওই ব্যক্তিও আসলে কাফির, তবে বাহ্যত মুসলিম হওয়ার কারনে তাকে কাফির না বলে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিকরা প্রতারক কাফির, এরা আল্লাহ, রাসূল ও মুসলিম জাতির সাথে প্রতারনা করে থাকে তাই দুনিয়ার জীবনে এদের বিধান অন্য কাফিরদের থেকে ভিন্ন এবং আখেরাতে এদের সাজা অন্য কাফিরের চেয়ে আরো জঘন্য, আখেরাতে এরা জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। (দেখুন সূরাহ আল-নূরঃ ১৪৭-১৫১)
- শয়তান কাফিরঃ যে কাফির কুফরের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে সে হচ্ছে শয়তান কাফির। (দেখুন সূরাহ আল-বাক্বারাহঃ ১৪)
- ত্বাগূত কাফিরঃ যে কাফির আল্লাহ, রাসূল তথা ইসলামের বিরোধিতায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে সে হচ্ছে ত্বাগূত কাফির। (দেখুন সূরাহ আল-নিসাঃ ৬০)
- প্রত্যেক শ্রেণির কাফিরের ব্যাপারে ইসলামী সরকারের আচরন বিধি সমান নয় বরং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যা আগত অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

পর্যালোচনাঃ উল্লেখিত কাফিরদের মাঝে সবচেয়ে জঘন্যতম ও নিকৃষ্টতম কাফির হল মুসলিম কাফির তথা মুনাফিক। আল-কুরআনে

- সুরাহ আল-নিসার ১৫১তম আয়াতে এদেরকে "আসল কাফির" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।
- সূরাহ তাওবাহ এর ৮৪তম আয়াতে মৃত্যুর পর এদের জানাযা পড়তে বা এদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে
- সুরাহ আল-নিসার ১৪৫তম আয়াতে বলা হয়েছে "মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম গহবরে পতিত হবে"।

অনুচ্ছেদঃ ১১. কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় বিধান

ইসলামী সরকার ও মুসলিম জনতা কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের ব্যাপারে নিম্নের বিধানগুলো মেনে চলবে..

বিধানঃ ১. হারবী কাফিরের ব্যাপারে ইসলামী বিধানঃ নাস্তিক কাফির, মুশরিক কাফির ও সাধারণ কাফির যারা শত্রুদেশে বসবাস করে ফিক্বহের পরিভাষায় বলা হয় হারবী কাফির, মানে শত্রু-সেনা আর তাদের দেশকে বলা হয় "দারু-ল-হারব" মানে শত্রুদেশ বা যুদ্ধ ক্ষেত্র। ইসলামী বিধান মতে হারবী কাফিরকে শত্রুসেনা হিসেবে দেখা হয় এবং দারু-ল-হারবে আক্রমন বৈধ হয় যদি তারা ইসলামী সরকারের সাথে শান্তিচুক্তি না করে। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ তাওবাহ এর ৫ম আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতে।

আর এসব দেশ ও জাতি যদি ইসলামী সরকারের সাথে শান্তচুক্তি বা নিরাপত্তা চুক্তি করে নেয় তবে ওই দেশের কাফির নাগিরিকরা হয়ে যাবে আমনী কাফির, মানি নিরাপত্তা প্রাপ্ত কাফির।

বিধানঃ ২. যিম্মী কাফিরের ব্যাপারে ইসলামী বিধানঃ উক্ত ৩ শ্রেণীর কাফির যদি ইসলামী সরকারের আনুগত্য মেনে নিয়ে ইসলামী দেশে বসবাস করে তবে তাদেরকে বলা হয় "যিম্মী কাফির" মানে যে কাফিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইসলামী সরকার ও মুসলিম জনতার দায়িত্ব হয়েগেছে। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ তাওবাহ এর ৬ষ্ঠ আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতে।

বিধানঃ ৩. কিতাবী কাফিরের ব্যাপারে ইসলামী বিধানঃ কিতাবী কাফির বা আহলে কিতাব কাফিরকে ইসলামী শারীয়াহ ৩টি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। যথা..

১. তাদের দেশ ও জাতি যদি ইসলামী সরকারে শ্রেষ্টত্ব মেনে নিয়ে জিযইয়াহ দিতে সম্মত হয় তবে তাদের দেশ ও জাতিকে স্বীকৃত দিতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ তাওবাহ এর ২৯তম আয়াতে।

২. তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা মুসলিম পুরুষদের জন্য হালাল করা হয়েছে। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ মা-ইদাহ এর ৫ম আয়াতে।

৩. তাদের জবেহকৃত পশু ও পাখীর মাংস খাওয়া মুসলিমদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (দেখুন সূরাহ মা-ইদাহঃ ৫)

বিধানঃ ৪. মুসলিম কাফির তথা মুনাফিকদের ব্যাপারে ইসলামী বিধান হল..

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (91)

পটভূমিঃ যাইদ বিন ছাবিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. অহুদ যুদ্ধে বের হলেন। সাথে আরো অনেক মুসলিম বের হয়েছিলেন কিন্তু কিছু লোক যুদ্ধ না করেই ফিরে গেল, যা পালিয়ে যাবার শামিল। ইসলামী বিধান মতে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মহাপাপ তথা মারাত্মক অপরাধ। তাই যুদ্ধ সমাপ্তির পর এদের বিচার নিয়ে কথা উঠল। সাহাবাদের কেউ কেউ বললেনঃ এদের হত্যা করা হক আর কেউ কেউ এতে অসম্মতি জানালেন (এবং বিষয়টি নিয়ে সামান্য বিবাদ সৃষ্টি হল। -কুরতুবীঃ মুসলিম) এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৮৮. (হে মুঅমিনগণ!) তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন মুনাফিকদের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলে? আল্লাহ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের কারণেই। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তোমরা কি তাদেরকে হেদায়াত করতে চাও? আল্লাহ কাউকে বিভ্রান্ত করতে চাইলে তাদের (হেদায়াতের জন্য) তোমরা কোনো পথ খুঁজে পাবে না।

৮৯. (যারা যুদ্ধ থেকে পালিয়েছে তারা কুফর করেছে) তারা চায়; যেন তোমরাও কুফর কর যেমন তারা কুফর করছে, যেন তোমরা ও তারা সমান হয়ে যাও। (যেহেতু তারা তোমাদেরকে দিয়ে কুফর করাতে চায়) তাই তোমরা তাদেরকে ওয়ালী হিসেবে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ না সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহর পথে ফিরে আসে। আর তারা বিমুখ হলে তাদের যেখানে পাবে সেখানেই পাকড়াও করবে এবং (প্রয়োজনে) হত্যা করবে। আর (শোন!) তোমরা তাদের কাউকেই ওয়ালী বা সাহায্যকারী বানাবে না। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুন বাকারাহঃ ১০৭)

৯০. তারা (মুনাফিকরা তোমাদের থেকে পালিয়ে গিয়ে) যদি এমন কোনো জাতির সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমাদের শান্তিচুক্তি রয়েছে, অথবা তারা যদি নিরুপায় হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসে এবং তোমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করে (তবে তোমরা তাদেরকে আশ্রয় দেবে। মনে রাখবে) আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতে পারতেন, তখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে (অস্ত্র ধরত) যুদ্ধ করত।

আর তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর তারা যদি যুদ্ধ না করে শান্তি প্রস্তাব পাঠায় তখন তোমরা এ প্রস্তাব মেনে নেবে। (তখন) তাদের বিরুদ্ধে (সামরিক) ব্যবস্থা নিতে আল্লাহ তোমাদের জন্য (বৈধতার) কোনো পথ খোলা রাখেননি।

জ্ঞাতব্যঃ মুসলিম ভাতৃত্ববোধ এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এ আয়াতটি মাইলফলক। মুনাফিকী, শত্রুতা, সমাজ ও সরকারের বিরোধিতা করা স্বত্ত্বেও হাতিয়ার না ধরলে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিতে বারণ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র মানবিক কারণে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মানবাধিকার ও ক্ষমার এমন নমুনা ইসলাম ছাড়া আর কে দেখাতে পারবে?

৯১. আর তোমরা এমনকিছু মানুষও পাবে যারা (বহুরূপী ও ধূর্ত, যারা মুসলিম কাফির সবার সাথে সমান তালে সম্পর্ক রাখে। কারণ তারা) তোমাদের থেকেও নিরাপদ থাকতে চায় আবার তাদের স্বজাতি (কাফিরদের) থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়। (এরা নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়, আবার) ফিতনার (কুফর শিরকের) প্রতি আহবান করা হলে তাতেও জড়িয়ে পড়ে। এসব লোক যদি তোমাদের (সাথে যুদ্ধ) থেকে নিবৃত্ত না হয়, সন্ধির প্রস্তাব না পাঠায় এবং নিজেদের হাতকে সংযত না রাখে, তবে তারা যেখানে অবস্থান গড়বে সেখান থেকেই ধরে আনবে এবং (প্রয়োজনে) হত্যা করবে, কারণ এদের বিরুদ্ধে (প্রয়োজনীয় যে কোনো) ব্যবস্থা নিতে আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে বৈধতা দিয়েছি।

আইন ও বিধানঃ উপরের আয়াতসমূহে মুনাফিকের সাথে ইসলামী সরকারের আচরণবিধি বর্ণিত হয়েছে। এসব হল ইসলামী দেশের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মানবাধিকারের নীতিমালা সম্বলিত বিধান। যেমন..

- মুনাফিকরা যদি ইসলামী সরকারের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং ইসলামী সরকারের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো দেশ বা জাতির সহিত মিলিত হয় তবে ইসলামী সরকার মানবিক কারণে তাদের বিরোদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেবে না।

- মুনাফিকরা যদি ইসলামী সরকারের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবার পর আবার ফিরে আসে এবং ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অঙ্গীকার করে তবে ইসলামী সরকার মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দেবে।
- মুনাফিকরা যদি ইসলামী সরকারের সাথে বিদ্রোহ করে শত্রুর সহিত মিলিত হয়, তবে তাদেরকে শত্রু হিসেবেই দেখা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে যে কোনো পদক্ষেপ নেয়া বৈধ হবে।
- মুনাফিকরা যদি ইসলামী দেশের সীমান্তের বাইরে গিয়ে আলাদা বসবাস করে এবং ইসলামী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না জড়ানোর অঙ্গীকার করে তবে ইসলামী সরকার তাদের বিরোদ্ধে কোন পক্ষেপ নেবে না। আর যদি এমন কোনো প্রতিশ্রুতি না দেয় তবে সরকার তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে।

বিধানঃ ৫. শয়তান কাফির ও ত্বাগূত কাফিরদের ব্যাপারে ইসলামী বিধানঃ শয়তান কাফির ও ত্বাগূত কাফিরের আনুগত্য মানা যাবে না, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ আল-আহযাবের ৪৮তম আয়াতে। প্রয়োজনে এদের বিরোদ্ধে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে, রাসূল সা. যেমনটি করেছিলেন কায়াব বিন আশরাফ ও আবু রাফি' কাফিরের বেলায়। যে কথা বর্নিত হয়েছে বুখারীর প্রসিদ্ধ হাদীছে।

অনুচ্ছেদঃ ১২. বর্তমান মানব সমাজে প্রচলিত কুফরের কিছু নমুনা

কুফর যেহেতু ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। তাই কোনো মুসলিম যদি আধুনিক বা সনাতন কোনো প্রকার কুফরে জড়িয়ে পড়ে তবে যেহেতু তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়, সেহেতু কুফর সম্পর্কে জানা ও বুঝা অপরিহার্য। সহজভাবে বুঝার জন্য বর্তমান বিশ্বে এবং আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু কুফরের নমুনা নিম্নে পেশ করা হল। যেমন..

কুফরের নমুনাঃ ১. স্যাকুলারিজমঃ স্যাকুলারিজমকে আমাদের সমাজে বলা হয় ধর্মনিরপক্ষ মতবাদ। স্যাকুলারিজম বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত একটি সামাজিক দর্শনের নাম। স্যাকুলারিজমের মূল বিষয় হল ইসলামকে দেশ, সমাজ ও জাতি থেকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিগত কিছু কাজের সাথে আবদ্ধ এবং ঐচ্ছিক করে ফেলা। আর এমন করা সুস্পষ্ট কুফর, এতে ইসলামের অঙ্গহানী হয়। কারণ ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ইসলামী অনুশাসন মেনে নেওয়া ও মেনে চলা।

কুফরের নমুনাঃ ২. গণতন্ত্রঃ গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত একটি রাজনৈতিক দর্শন। গণতন্ত্রের মূলকথা "মানুষের সার্বভৌমত্ব"। যেটা সরাসরি ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী। কারণ ইসলাম এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের শিক্ষা দেয়। আসলে শুধু আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম হয় আর আল্লাহ ছাড়া অন্যসকলের মালিকানা হয় বিধিবদ্ধ। উল্লেখ্য মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ✓ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ✓ আর যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম।

কুফরের নমুনাঃ ৩. আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদঃ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত একটি জাতীয়তাবাদী দর্শন। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের মূলকথা হচ্ছে অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন। যেটা সরাসরি ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থী। কারণ ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদঃ একটি জাতি অন্য জাতির কাছে যে পরিচয়ে পরিচিত হয় এটাই তার জাতীয়তা। আর যে নীতি বা আদর্শের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় এটা হল জাতীয়তাবাদ। মানুষের মাঝে তিন ধরনের জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য করা যায়। যথা..

১. আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদঃ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল তথা ভৌগলিক সীমারেখাকে কেন্দ্র করে জাতি গঠনের নীতি বা দর্শনকে বলা হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দর্শন, বর্তমানে বিশ্বের দেশে দেশে এ নীতিই মানা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে ইসরাঈল ছাড়া আর সকল দেশেই এ নীতি মেনে অঞ্চল ভিত্তিক জাতি গঠন করা হয়েছে। যেমন..

- আমরা যারা বাংলাদেশের নাগরিক তারা বাংলাদেশী
- যারা ভারতের নাগরিক তারা ভারতী
- যারা পাকিস্তানের নাগরিক তারা পাকিস্তানী
- যারা ইরাকের নাগরিক তারা ইরাকী
- যারা সৌদি আরবের নাগরিক তারা সৌদি, ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ = ইসলামী বিধান মতে দুনিয়ার সকল মুসলিম একই জাতি, মুসলিম জাতি। তাই অঞ্চল ভিত্তিক প্রদেশ, দেশ, ইমারাত, সালতানাত গঠন করলেও অঞ্চল ভিত্তিক জাতি গঠন কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়।

২. ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদঃ একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে কেন্দ্র করে যখন জাতি পরিচিত হয়; তখন একে বলা হয় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যেমন..

- আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বা অন্য দেশের নাগরিক হলেও) তারা বাঙ্গালী।
- যারা আরবী ভাষায় কথা বলে (সৌদি আরব, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইত্যাদি যে কোনো দেশের নাগরিক হক) তারা সবাই আরবী।

৩. ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বা ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদঃ একটি জাতি যখন ধর্মকে কেন্দ্র করে গঠিত ও পরিচিত হয় তখন এটাকে বলা হয় ধর্মীয় জাতীয়াতাবাদ বা ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যেমন..

- আমরা যারা ইসলাম মেনে চলি তারা মুসলিম

- যারা খৃষ্টানিজম মেনে চলে তারা খৃষ্টান
- যারা ইয়াহুদীবাদ মেনে চলে তারা ইয়াহুদী
- যারা হিন্দুত্ববাদ মেনে চলে তারা হিন্দু, ইত্যাদি।

কুফরের নমুনাঃ ৪. পুজিবাদঃ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত একটি অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক মতবাদ হচ্ছে পুজিবাদ। পুজিবাদের মূলকথা; সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা। যেটা সরাসরি ইসলামের সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী। কারন ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান হচ্ছে সূদ হারাম। ইসলামী বিধানের একটি মূলসুত্র হচ্ছে **আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের কোনো হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত কোনো ফরজকে অবজ্ঞা করা অথবা কোনো হারামকে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া কুফর।** আর পুজিবাদ সুদকে বৈধতা দেয়। তাই এটা কুফর।

কুফরের নমুনাঃ ৫. বস্তুবাদঃ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত একটি দর্শন হল বস্তুবাদ, যা মানুষকে বস্তুনির্ভর বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেয়। বস্তুবাদের মূল বিশ্বাস "যাকিছু হয় বস্তু থেকেই হয়"। বস্তুবাদ তাক্বদীরের পরিপন্থী, যা সরাসরি আমাদের ঈমানে আঘাত করে। কারন ঈমানের ৬টি মূলনীতির ১টি হচ্ছে তাক্বদীরে বিশ্বাস। তবে বস্তু বা বস্তুর প্রয়োজনীয়তাকে অবজ্ঞা করেনি ইসলাম। আসলে বস্তু একটি মাধ্যমমাত্র, আসল ফয়সালা আসে আল্লাহ থেকে।

কুফরের নমুনাঃ ৬. প্রকৃতিবাদঃ প্রকৃতিবাদ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত একটি বিশ্বাসগত দর্শন। প্রকৃতিবাদের মূলকথা হচ্ছে "সবকিছু প্রকৃতির সৃষ্টি এবং প্রকৃতিই মহান স্রষ্টা"। যেটা সরাসরি ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থী। কারন ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে "সবকিছু আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহই একমাত্র মহান স্রষ্টা"।

কুফরের নমুনাঃ ৭. হাওয়াঃ মানবরচিত ও মনগড়া মতবাদ, দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা ও বিধিবিধানকে একত্রে বলা হয় হাওয়া। হাওয়া বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত একটি নৈতিক ও আদর্শিক দর্শন। হাওয়ার মূলকথা হচ্ছে মানুষ নিজেরাই নিজেদের জন্য আইন, দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা ও মতবাদ তৈরি করবে এবং এ বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম। যেটা সরাসরি ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থী। কারন ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে মানুষকে সবকিছু করতে হবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ও রাসূলের দেওয়া মূলনীতি মেনে। তাই মানুষ স্বাধীন হলেও সার্বভৌম নয়। কারন তাকে জবাবদিহি করতে হয় এবং করতে হবে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)

(হে নবী! সবশেষে) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযথ কিতাব, যা আগেকার সকল কিতাবের সত্যায়ন ও সংরক্ষনকারী। সুতরাং তুমি (মুহাম্মাদ এবং তোমার উম্মত) "হুকম" (বিচার, শাসন, আদেশ জারিও আইন প্রনয়ন) করবে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব ও বিধান মতে। তোমার কাছে আগত সঠিক বিধানের বিপরীতে মানুষের **"আহওয়া"** (মনগড়া কোনোকিছু) মেনে নিবে না। আমি তোমাদের সকলের জন্য শারীয়া'হ ও মিনহাজ (জীবন বিধান ও কর্মপদ্ধতি) ঠিক করে দিয়েছি। (সুতরাং তোমরা সবাই আমার নির্ধারিত নীতিমালা ও মিনহাজ মেনে চলবে এবং এর বিপরীতে মানুষের বানানো সকল আদর্শ, দর্শন, মতবাদ, নীতিমালা ও বিধিবিধান বর্জন করবে আর মনে রাখবে) আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে একই জাতিভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু (তিনি এমন না করে) তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন তদীয় বিধান দিয়ে। তাই তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করবে। তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাচ্ছ। যেসব বিষয়ে তোমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছ তিনিই দেবেন এর সঠিক ফয়সালা। (৫ মা-ইওদাহঃ ৪৮)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ধর্ম, সমাজ, দেশ, জাতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কার, সংস্কৃতি, বিচার, শাসনসহ জীবনের তাগিদে যাকিছু প্রয়োজন হয় এসবের সমন্বয়ে মহান আল্লাহ্ যে জীবন আদর্শ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এটাই ইসলাম। বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে ইসলামী বিধান। একটি দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য বিচার ও শাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই জীবনের অন্যান্য বিষয়াদির মত বিচার এবং শাসনেও আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে, এটাই ঈমানের দাবী এবং এটাই আল্লাহর আদেশ। এতে অন্যকিছু করলে আল্লাহর বিধানের সাথে কুফর করা হবে এবং এর ফলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। আর যে মুসলিম এমন কাজ করবে সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। যদিও সে নামাযী, হাজী, দাড়িওয়ালা, রোজাদার ও পর্দাশীল হয়।

আহওয়া ও হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া, মানব রচিত, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। আর হাওয়া শব্দের বহুবচন হচ্ছে আহওয়া। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে, যতকিছু আছে এসবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"। মানুষ নানাভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন..

- অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় /মেনে চলে। এসবই হাওয়ার অনুকরণ।
- অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া মসলক, মিনহজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- এভাবে নানা জনে নানা পদ্ধতিতে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে।
- আমাদের সমাজে হাওয়ার ৪টি ধরণ রয়েছে। যথা..
  ১. দার্শনিকদের দ্বারা তৈরিকৃত হাওয়া আমাদের কাছে দর্শন, আদর্শ ও মতবাদ নামে পরিচিত
  ২. রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা তৈরিকৃত হাওয়া আমাদের কাছে আইন, বিধান বা নীতিমালা নামে পরিচিত

৩. সামাজিক মুরব্বীদের দ্বারা তৈরিকৃত হাওয়া আমাদের কাছে সংস্কার ও সংস্কৃতি নামে পরিচিত

৪. উলামা ও পীর-মাশায়েখদের দ্বারা তৈরিকৃত হাওয়া আমাদের কাছে মসলক, মিনহাজ ও তরীকা নামে পরিচিত। এসবের দ্বারা উম্মতকে বিভক্ত করা হলে এগুলো অবশ্যই কুফর হবে আর শুধুমাত্র পরিচয়ের জন্য হলে ভিন্ন কথা।

কুফরের নমুনাঃ ৮. বিভক্তি ও বিভাজনঃ আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত কুফরের আরো একটি নমুনা হচ্ছে বিভক্তি ও বিভাজন। আজকাল আলিম নামধারী কিছু বিভ্রান্ত মানুষ মুসলিম জাতির মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন সৃষ্টি করে উম্মতকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছেন। অথচ মুসলিমজাতির মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করা এবং যারা এমন করে তাদের আনুগত্য ও অনুকরণ করা সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ। এমনকি যে বা যারা এমন করে নবী সা.-র সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় বলেও হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)

আর (শুনো!) তোমরা (দুনিয়ার সকল মুসলিম) ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর আদর্শ আঁকড়ে থাকবে, তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে না। তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, আল্লাহ (ইসলামী ভাতৃত্ববোধ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শে) তোমাদের অন্তরকে পরস্পরে মিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর দয়ায় তোমরা এখন ভাই ভাই হয়ে গেছো। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১০৩)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)

আর (হে আমার বান্দারা!) তোমরা তাদের মত হইও না! যারা পরস্পরে মতবিরোধ করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে (ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলেছে) অথচ তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল সুস্পষ্ট প্রমান (আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অতীতে যারা দলাদলি করেছে এবং তোমাদের যারা দলাদলি করবে) তাদের তরে মহা আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১০৫)

আইন ও বিধানঃ উক্ত আয়াতে তাদের সঙ্গ দিতে এবং সমর্থন করতে নিষেধ করা হয়েছে যারা পরস্পরে মতবিরোধ করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ যারা ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলেছে এবং বানিয়ে ফেলছে। তাই ইসলামী বিধান মতে বিবাদ, বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি যেমন নিষিদ্ধ ঠিন তেমনিভাবে যারা এসব জঘন্য কাজ করে তাদের সঙ্গ দেওয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ। অতীতে এমনটি করেছিল ইয়াহুদ উলামা আর বর্তমানে আমাদের অনেক লোকও একই পথে ধাবিত হচ্ছে।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)

(হে নবী!) যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায় তুমি তাদের কেউ নও (তোমার সাথে তদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।) তাদের (বিচারের) বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকল। তিনিই দেবেন তাদের কর্মফল। (৬ আনয়ামঃ ১৫৯)

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)

এটাই (ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলাই) আমার পথ, সোজা পথ। তোমরা (মুসলিমরা) সবাই (ঐক্যবদ্ধভাবে) এ পথ আঁকড়ে থাকো, ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুকরণ করো না। এতে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমাদের এমন আদেশ দেয়া হল যেন তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া) (৬ আনয়ামঃ ১৫৩)

এমন কুফরের সাথে কারা জড়িতঃ উল্লেখ্য বর্তমান সমাজের দুই ধরনের মুসলিম এমন কুফরের সাথে জড়িত।

১. আমাদের রাজনৈতিক নেতারাঃ যারা মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী খিলাফাহ বাদ দিয়ে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ মেনে নিয়ে এক জাতিকে ভেঙ্গে বহু জাতি তৈরি করেছে এবং আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের মনগড়া দর্শন মেনে নিয়েছে ও মেনে নিচ্ছে।

২. আমাদের কিছু আলিম উলামাঃ যারা ইসলামের সীমানা ভঙ্গ করে মসলক, মিনহাজ ও তরীকার নামে উম্মতকে ছিন্ন ভিন্ন করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন এবং করে যাচ্ছেন।

কুফরের নমুনাঃ ৯. আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শ মেনে বিচার বা শাসন না করাঃ আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত কুফরের আরো একটি নমুনা হচ্ছে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের নীতিমালা মেনে বিচার বা শাসন না করা। আজকাল মুসলিমদের দেশে দেশে এমন সমাজ ব্যবস্থা চালু রয়েছে যা আগেকার মুসলিমরা কল্পনাও করতে পারেনি। আসলে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের নীতিমালার বাইরে গিয়ে বিচার ও শাসন করা সুস্পষ্ট কুফর। ইরশাদ হচ্ছে..

যে বা যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত "হুকম" (বিচার, শাসন, আদেশ জারি ও আইন প্রণয়ন) করে না তারা কাফির (৫ মাইদাহঃ ৪৪)	وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

শব্দ পরিচিতিঃ হুকমঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটাই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটাই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্বীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়া'হ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)

- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসনব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হা'কিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নিরধারক)

কোনো মুসলিম এমন করলে সে আর মুঅমিন থাকে না, মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)

তারা (মুসলিমরা) বলে "আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের আনুগত" অতঃপর তাদের কিছু মানুষ অন্যপথে ফিরে যায়। (যারা এমন করে) এরা মুঅমিন নয় (কারণ) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর (কুরআন বা হাদীছে) ব্যক্তিগত ফায়দা হলে অনুগত হয়ে ছুটে আসে। তবে কী এদের অন্তরে রোগ, না এরা সন্দিহান, নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে এরাই অবিচারী (বিচার ও শাসন থেকে আল্লাহর বিধান বাদ দেয়াটাই মহা-অবিচার। যার অন্তরে ঈমান আছে সে এমন করতেই পারে না।) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (শারীয়া'হ আইনের) প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅমিনদের কথা হবে একটাইঃ শুনলাম আর মেনে নিলাম। যারা এমন করে (শুধু তারাই মুঅমিন এবং) তারাই সফল। (২৪ নূরঃ ৪৭-৫১)

কুফরের নমুনাঃ ১০. আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম মনে করাঃ

আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত কুফরের আরো একটি নমুনা হচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম মনে করা। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোন!) আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন তোমরা এসবকে হারাম বানিও না। আর (দ্বীনি ব্যাপারে) সীমালঙ্ঘন/বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহ কখনো সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (৫ মা-ইদাহঃ ৮৭)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ আমাদের রাব্ব। আমাদের জন্য হালাল হারাম তথা বৈধ অবৈধ নির্ধারনের একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন আল্লাহ তায়া'লা এবং এসব হল আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বের অংশ। আল্লাহর নির্ধারিত হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল হিসেবে মেনে নিলে কুফর হয়। আর এভাবে হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করলে বা যে করে তাকে মেনে নিলে বা এমন করা বৈধ মনে করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়। কুফর ও শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন লোক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ ৯/৮৪)

আল্লাহর নির্ধারিত কোনো হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বলা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল। এমন করা কুফর। উল্লেখ্য আজকাল আমাদের সমাজে দুই ধরণের হারাম পরিলক্ষিত হয়। যথাঃ মানসূস হারাম ও মুজতাহাদ হারাম।

মানসূস হারামঃ যে হারামের কথা কুরআন বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এটা হল মানসূস হারাম। যেমনঃ মৃত পশুপাখি, শূকরের মাংস এবং প্রবাহমান রক্ত। এসব বস্তু হারাম হওয়ার কথা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানসূস হারামকে হালাল বা মানসূস হালালকে হারাম মনে করা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।

মুজতাহাদ হারামঃ যে হারাম কুরআন বা হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি বরং ফিকহী নিয়মের আওতায় পড়ে নিষিদ্ধ হয়েছে, এটা হল মুজতাহাদ হারাম। মুজাতাহাদ হারাম আসলে হারাম নয় বরং মাকরূহ। ইসলামের প্রথম যোগে এগুলোকে মাকরূহ হিসেবেই মানা হত। তারপর এলো ফিকহ বিশ্লেষণের যোগ। তখন বলা হল মাকরূহ তাহরিমী। তারপর মাকরূহ তাহরিমীকে বিশ্লেষণ করে বলা হল "হারামের কাছাকাছি"। আর বর্তমানে অতি বাড়াবাড়ি করে অনেকেই এসব বিষয়কে বলছেন হারাম আর অতি বাড়াবাড়ি করে কেউ কেউ বলে থাকেন সাফ হারাম। যেমনঃ কচ্ছপ, ডলফিন বা কাকড়া খাওয়া। মুজতাহাদ হারামের ব্যাপারে ভিন্নমত থাকা স্বাভাবিক। এসব ব্যাপারে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত গ্রহণ যোগ্য এবং এতে পাপ হয় না।

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (60)

(হে নবী! তাদের) বলো (জিজ্ঞেস কর) তোমরা কী ভেবে দেখেছো? আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব রিজিক (জীবন উপকরণ) দিয়েছেন আর তোমরা (তোমাদের ইচ্ছামত) এসবকে হালাল ও হারাম বানাচ্ছ (এর পরিণতি কি হতে পারে?) জিজ্ঞেস করঃ এমন করার জন্য আল্লাহ কী তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন? না কী তোমরা (নিজেরাই হালাল-হারাম নির্ধারণ করে) আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করছ? যারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে পরকাল সম্পর্কে তাদের কী ধারণা (তারা কি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে?) আসলে আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর আদায় করে না। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শোকর করা) (১০ ইউনুসঃ ৫৯-৬০)

জ্ঞাতব্যঃ হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, করণীয়-বর্জনীয় তথা জীবন বিধান নির্ধারনের একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ তায়া'লা এবং আল্লাহর অনুমোদন ক্রমে রাসূল সা.। অন্য কেউ এমন করলে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার হবে।

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116)

(হে আমার বান্দারা!) তোমরা (আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে) নিজেদের যবান দরাজ করে "এটা হালাল আর এটা হারাম" বলে মিথ্যাচার করো না। এতে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করা হয়। আর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে তারা সফল হতে পারে না। (১৬ নাহ'লঃ ১১৬)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা কুফর। অথচ আমাদের সমাজে নানাভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা হয়ে থাকে..

- আল্লাহ্ বলেননি এমন কোনো কথাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন অনেকে বলে থাকেন আল্লাহ্ নাকি বলেছেন "বান্দা তোর নাই হুঁশ আমার কি দুষ" ইত্যাদি।
- যা দেওয়ার অধিকার শুধুই আল্লাহর হাতে এমন কোনো কিছুকে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন.. এমন দাবী করা যে আমার কাছে ওহী আসে। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেও সন্তান, সম্পদ বা অন্য কোনোকিছু দিতে পারবে বলে মনে করা।
- যে কথা বলার অধিকার শুধুই আল্লাহর এমন কিছু বলে ফেলা। যেমন আল্লাহ বা রাসূল থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত না হলেও কোনো বিষয়ে মন্তব্য করে বলা "এটা হারাম বা এটা হালাল"।

উল্লেখ্য মুজতাহিদ ঈমামগণ সাধারণত এমন বলতেন না। সাধারণত উনারা বলতেনঃ এটা করবে, এটা করবে না। এটা করা যাবে, এটা করা যাবে না। এটা করতে সমস্যা নেই, এটা করা উচিত নয়, ইত্যাদি। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে সবকিছুতেই সাফ হারাম, হালাল, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। মনে রাখবেন আলিম উলামা উপদেশ দিতে পারেন কিন্তু আল্লাহর বিধানের বিপরীতে নিজে বানিয়ে কোনো বিধান দিতে পারেন না।

বিঃ দ্রঃ = বিধান দেওয়া একমাত্র আল্লাহর কাজ এবং আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে রাসূলগণ এ কাজটি করে থাকেন। তবে আল্লাহ ও রাসূল কখনো কখনো কোনো সরাসরি আইন না বলে আইনের সূত্র বাতলে দিয়েছেন। এসব সূত্র ধরে আইন তৈরি করতে পারবে মানুষ, করতে পারবেন আলিমগণ।

এমন কুফর কারা বেশী করেনঃ আমাদের বর্তমান সমাজের এক শ্রেনীর আলিম উলামা এমন কুফরের সাথে জড়িত। তারা নিজেদের মতাদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য এবং অন্যদেরকে ভুল প্রমান করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এমনটি করে থাকেন।

অনুচ্ছেদঃ ১৩. কুফর চিনার কিছু সহজ উপায় বা সূত্র

কুফর একটি নৈতিক, আদর্শিক ও বিশ্বাসগত পাপ, তবে মাঝে মাঝে বাস্তব কর্মের মাধ্যমেও এর প্রতিফলন ঘটে। আমাদের সমাজের লোকজন নানা ভাবে, নানা নামে ও নানা পদ্ধতিতে কুফর করে থাকে। সমাজে প্রচলিত কুফরগুলোকে সহজভাবে চিনার জন্য নিম্নে কিছু উপায় বা সূত্র পেশ করা হল। আশাকরি এসব সূত্র ধরে কুফর চিনা অনেকটা সহজ হবে। যেমন..

সূত্রঃ ১. অবিশ্বাসঃ আল-কুরআনে বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছে উল্লেখিত কোনো সুস্পষ্ট তথ্য অবিশ্বাস করা কুফরের একটি সহজ সূত্র।

যেমনঃ আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়ে আল্লাহ জিন্ন সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে। এখন কেউ যদি জিন্ন বিশ্বাস না করে তবে কুফর হবে। উল্লেখ্য জিন্নকে আমাদের সমাজে জিন, পরি, ভুত, ফেরত, দৈত্য, দানব, ইত্যাদি নানা নামে ডাকা হয়।

সূত্রঃ ২. গোপন করাঃ কুফরের আরো একটি সূত্র হচ্ছে গোপন করা তথা আল-কুরআন বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছে উল্লেখিত কোনো সুস্পষ্ট তথ্য গোপন করা।

যেমনঃ আল-কুরআনে বিচার, শাসন, জিহাদ, ক্বিতাল, হুদুদ, ক্বিস্বাস্ব, ইত্যাদি বিষয়ের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কেউ যদি জেনেবুঝে এসব বিষয়কে গোপন করে, জনত্র সামনে প্রকাশ না করে বা এড়িয়ে যায় তবে কুফর হবে।

সূত্রঃ ৩. প্রত্যাখ্যানঃ কুফর চিনার আরো একটি সূত্র হল প্রত্যাখ্যান করা তথা আল-কুরআনে বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছে উল্লেখিত কোনো সুস্পষ্ট তথ্য বা বিধান প্রত্যাখ্যান করা।

যেমনঃ বিচার, শাসন, জিহাদ, ক্বিতাল, হুদুদ, ক্বিস্বাস্ব, হিজাব, ইত্যাদি বিষয়ের কথা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলো মেনে নেওয়া ও মেনে চলাকে ফরজ। এখন কেউ যদি এর কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে তবে কুফর হবে।

সূত্রঃ ৪. অবজ্ঞা বা অবহেলাঃ কুফর চিনার আরো একটি সূত্র হল অবজ্ঞা বা অবহেলা করা তথা আল-কুরআনে বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছে উল্লেখিত কোনো সুস্পষ্ট তথ্য বা বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা।

যেমনঃ সুদ হারাম, হিজাব ফরজ। এ বিধান দুটি আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এসব বিধানের কোনোটিকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর।

সূত্রঃ ৫. নীতিগতভাবে অমান্য করাঃ কুফর চিনার আরো একটি সূত্র হল নীতিগতভাবে অমান্য করা তথা আল-কুরআনে বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছে উল্লেখিত কোনো সুস্পষ্ট তথ্য বা বিধানকে নীতিগতভাবে অমান্য করা বা মেনে না নেওয়া।

যেমনঃ যিনা করা হারাম। এ বিধানটি আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কেউ যদি এ বিধানকে নীতিগতভাবে মেনে না নেয় এবং মনে করে যে; প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষ সেচ্ছায় যৌন মিলন করলে দুষের কিছু নেই তবে এটা কুফর হবে। আর নীতিগতভাবে আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়ার পর বাস্তব জীবনে মেনে চলতে না পারলে পাপ হয়, মহাপাপ।

সূত্রঃ ৬. হালাল-হারাম নির্ধারনঃ কুফর চিনার আরো একটি সূত্র হল আল্লাহর বিধান ব্যতীরেখে নিজেদের মত করে হালা-হারাম নির্ধারন। তথা আল্লাহর নির্ধারিত হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল মনে করা।

যেমনঃ মদ পান করা হারাম। এ বিধানটি আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কেউ যদি (ইসমলাম বিরোধী দেশীয় আইন মেনে নিয়ে) মদপানকে বৈধ মনে করে তবে কুফর হবে।

সূত্রঃ ৭. বিপরীত বিশ্বাসঃ কুফর চিনার আরো একটি সূত্র হল বিপরীত বিশ্বাস তথা আল-কুরআনে বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছে উল্লেখিত কোনো সুস্পষ্ট তথ্যের বিপরীতে কোনোকিছু বিশ্বাস করা।
যেমনঃ আল-কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে "মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে"। এখন এ তথ্যের বিপরীতে গিয়ে কেউ যদি মনে করে; মানুষ বানত থেকে রূপান্তরিত হয়েছে তবে এটা কুফর হবে।

সূত্রঃ ৮. মানব রচিত বা মনগড়া মতবাদঃ কুফর চিনার আরো একটি সূত্র হল মানব রচিত বা মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেওয়া তথা আল-কুরআনে বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছের বিপরীতে মানব রচিত বা মনগড়া কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা, বিধিবিধানসহ কোনোকিছু মেনে নেওয়া। এমন করলে কুফর হয়।
যেমনঃ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, স্যাকুলারিজম, ইত্যাদি।

সূত্রঃ ৯. শত্রুতাঃ কুফর চিনার আরো একটি সূত্র হল আল্লাহ, আল্লাহর কোনো ফিরিস্তা, কোনো নবী বা রাসূলের সাথে শত্রুতা রাখা। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারাহঃ ৯৮, নিসাঃ ১৫৫সহ আরো অনেক আয়াতে।

সূত্রঃ ১০. মিত্রতাঃ কুফর চিনার আরো একটি সূত্র হল মিত্রতা ও অভিভাকত্ব, মানে কোনো কাফির, মুশরিকের সাথে মিত্রতা করা অথবা তাদের অভিভাকত্ব মেনে নেওয়া।
যেমনঃ কুফরতান্ত্রীক কোনো দেশ, জাতি বা সংঘঠনের সাথে জোট বাধা বা মিত্রতা করা অথবা কোনো কাফির বা মুশরিকের অভিভাকত্ব মেনে নেওয়া। ইরশাদ হচ্ছে..

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139)

মুনাফিকদের এই মর্মে সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাদের তরে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, যারা মুঅমিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে আওলিয়া বানায়। মুনাফিকরা কী ওই কাফিরদের কাছে ইজ্জত চায়? আসলে সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (আওলিয়া হল ওয়ালী শব্দের বহুবচন। আর ওয়ালী অর্থ অভিভাবক, মিত্র, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি। -৪ নিসাঃ ১৩৮-১৩৯)

উল্লেখ্য এখানে মাত্র ১০টি সূত্র দেওয়া হল। আশা করি এখন চিনতে পারবেন একটি পাপ কখন কুফর হবে আর কখন হবে না।

৩য় অধ্যায়ঃ শিরক

প্রারম্ভিক কথাঃ শিরক আসলে কুফরের মতই নৈতিক, আদর্শিক ও বিশ্বাসগত মহা-পাপ। যদিও মাঝে মাঝে বাস্তব কাজে-কর্মেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। শিরক ঈমান ও আ'মাল বিনষ্টকারী মহাপাপ। সনাতন বা আধুনিক সকল প্রকার শিরকের প্রভাবেই ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নস্যাত, নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তাই সাবধান! বন্ধুগণ! ছোট বা বড় সকল প্রকার শিরক থেকে সাবধান!! সহজভাবে বুঝার জন্য এ অধ্যায়কে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যথা..

অনুচ্ছেদঃ ১. শিরক পরিচিতি
অনুচ্ছেদঃ ২. শিরক এর প্রকারভেদ
অনুচ্ছেদঃ ৩. শিরকের প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও পরিনতি
অনুচ্ছেদঃ ৪. মুসলিমরাও যেভাবে শিরক করে
অনুচ্ছেদঃ ৫. শিরকের কয়েকটি সূত্র
অনুচ্ছেদঃ ৬. শাফায়াত নিয়ে ভন্ডামী ও শিরকের পথে ধাবিত হওয়া
অনুচ্ছেদঃ ৭. শিরক থেকে বেচে থাকার একমাত্র পথ
অনুচ্ছেদঃ ৮. শিরকের উপকরণ
অনুচ্ছেদঃ ৯. আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক
অনুচ্ছেদঃ ১০. উলুহিয়্যাতে শিরক
অনুচ্ছেদঃ ১১. হাকিমিয়্যাতে শিরক
অনুচ্ছেদঃ ১২. রুবুবিয়্যাতে শিরক
অনুচ্ছেদঃ ১৩. বৈশিষ্ট্যে শিরক
অনুচ্ছেদঃ ১৪. কুফর ও শিরক একই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল পাপ
অনুচ্ছেদঃ ১৫. দুনিয়ার জীবনে কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

অনুচ্ছেদঃ ১. শিরক পরিচিতি

শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো, সমান ও সমকক্ষ নির্ধারণ করা, ইত্যাদি। মহান আল্লাহ তার জাতিসত্বা এবং যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে এক ও অদ্বিতীয়; এমন বিশ্বাসকে বলা হয় তাওহীদ। আর তাওহীদের বিপরীতে যা আছে সবই শিরক। অর্থাৎ মহান আল্লাহর জাতিসত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকাউকে বা অন্যকিছুকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা অংশীদার বানানো অথবা আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে বিশেষিত করা অথবা আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্যকে সম্মান বা শ্রদ্ধা জানাতে এমনকিছু করার নাম শিরক। যেমন..

- আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে, পরিবার আছে বলে বিশ্বাস করা। এসব হল আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক
- আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সার্বভৌমত্বের মালিক, ক্ষমতার উৎস বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। অথবা আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্যের প্রতি সম্মান বা শ্রদ্ধা জানাতে এমন কিছু করা। এগুলো হল আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর নীতির বিপরীতে নীতিনির্ধারক বা কর্তৃত্বশীল মনে করা। এটা আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহর বিপরীতে অন্যকে বিধানদাতা মনে করা বা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে নীতিগতভাবে অন্যের বিধান মেনে নেওয়া। এটা আল্লাহর বুরুবিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহ ছাড়া অন্যকে চিরঞ্জীব, আ'লিমু-ল-গাইব, হাজির-নাজির (সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা) মনে করা। এসব হল আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে শিরক। ইত্যাদি, ইত্যাদি..

উল্লেখিত কাজসমূহ বড় শিরক। এমন শিরকে জড়ালে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

আর আল্লাহর ছাড়া অন্যের নামে কসম করা, অন্যকে খুশী করার জন্য বা অন্যের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ইবাদাত করা, ইত্যাদি হল ছোট শিরক।

অনুচ্ছেদঃ ২. শিরক এর প্রকার ভেদ

শিরক দুই প্রকার হয়ে থাকেঃ বড় শিরক ও ছোট শিরক। বড় শিরককে আরবীতে বলা হয় শিরক আকবর আর ছোট শিরককে বলা হয় শিরক আসগর।

শিরক আকবরঃ মহান আল্লাহর জাতিসত্বা, রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা অংশীদার বানানো অথবা আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে বিশেষিত করা বড় শিরক। **মোট কথাঃ**

- আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে যা করা হয় অন্যের জন্য এমনকিছু করা,
- আল্লাহকে যেভাবে মর্যাদা দিতে হয় অন্যকে এমনভাবে মর্যাদা দেওয়া,
- আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসতে হয় অন্যকে এমনভাবে ভালোবাসা,
- আল্লাহকে যেভাবে শ্রদ্ধা করতে হয় অন্যকে এমনভাবে শ্রদ্ধা করা, ইত্যাদি, যেসবকাজ সরাসরি শিরক হয়ে যায় এগুলো হল বড় শিরক।

আর আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করা, অন্যকে খুশী করতে বা অন্য থেকে প্রতিদান পেতে আল্লাহর ইবাদাত করা, আল-কুরআনের আয়াত অথবা মাসনূন দোয়া ব্যতীত অন্যকিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলানো, ইত্যাদি যেকাজগুলো সরাসরি শিরক নয় তবে শিরকের মত, শিরকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন এগুলোকে বলা হয় ছোট শিরক।

অনুচ্ছেদঃ ৩. শিরকের পরিনতি

শিরক একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও ধ্বংসাত্বক মহাপাপ। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল হয়ে যায়। শিরকের প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও পরিনতি বড়ই ভয়াবহ। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করা হল..

পরিনতিঃ ১. ধিক্কার ও অভিশাপঃ শিরক করলে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন, কুল মাখলুক্ব শিরককারীকে লা'নত করে, ধিক্কার দেয় এবং তাদের বিরুদ্ধে ফুসে উঠে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا (96)

তারা বলেঃ রাহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন। (ওহে পাপিষ্ঠদের দল!) তোমরা অনেক বড় কথা বলে ফেলছ। আসমানসমূহ ভঙ্গে যেতে চায়, যমীন ফেটে যেতে চায়, পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে চায়, এজন্য যে তারা দাবী করেঃ রাহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ সন্তান গ্রহণ করা রাহমানের জন্য শোভনীয় নয়। কারণ আসমানসমূহ এবং যমীনের

সকলেই স্বেচ্ছায় রাহমানের দাসত্ব মেনে নিয়েছে। (তাই তার সন্তানের প্রয়োজনই নেই। তথাপিও যে বা যারা এসব মিথ্যা রটনা করছে) তিনি তাদের তালিকা তৈরি করছেন, নিপুণভাবে হিসাব রাখছেন (তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মফল দিতে কোনো অসুবিধা হবে না) কিয়ামতের দিন সবাই একা একা তার কাছে হাজির হবে। যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে দয়াময় অবশ্যই তাদের স্নেহ করবেন। (১৯ মারইয়ামঃ ৮৮-৯৬)

পরিনতিঃ ২. জঘন্যতম অপরাধীঃ পৃথিবীতে যত পাপ আছে, যত জুলম অন্যায় ও অবিচার আছে; শিরক এর মাঝে সবচেয়ে বড় ও জঘন্যতম মহাপাপ। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

নিশ্চয় শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলম। (৩১ লুকমানঃ ১৩)	إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

পরিনতিঃ ৩. ঈমান ও আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়ঃ শিরক এক সর্বনাশা মহাপাপ। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)

(হে নবী!) তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছেঃ "যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে" আর তুমি তখন (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৫)

পরিনতিঃ ৪. ক্ষমা ও রহমত থেকে চির বঞ্চিতঃ শিরক ক্ষমার অযোগ্য। যেব্যক্তি শিরক করল সে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে গেল। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (48)

আল্লাহ তার সাথে কৃত শিরক কখনো ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া বাকি পাপ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল, সে মহাপাপ করল। (৪ নিসাঃ ৪৮)

পরিনতিঃ ৫. চির জাহান্নামঃ যে ব্যক্তি শিরক করে সে আল্লাহর রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যায়। ফলে দুনিয়াতে হয় হেদায়াত বঞ্চিত আর আখেরাতে জান্নাত বঞ্চিত, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73)

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে আল্লাহ অবশ্যই (জাহান্নামে) আযাব দেবেন। আর মুঅমিন পুরুষ ও মুঅমিনাহ নারীর তাওবাহ কবুল করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৩৩ আহযাবঃ ৭৩)

অনুচ্ছেদঃ ৪. মুসলমানরা যেভাবে শিরক করে

কুফর ও শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে তার ঈমান, আ'মাল সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। কিন্তু অত্যান্ত পরিতাপের বিষয়ঃ ইসলাম গ্রহন করা সত্বেও অনেক মানুষই কোনো না কোনোভাবে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে যায়, তারা নামায রোজাও করে আবার কুফর শিরকও করে। আর এভাবে অনেক মুসলিমই মুশরিক হয়ে যায়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)

তাদের অনেকেই আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তথাপিও মুশরিক হয়ে যায়/মুশরিক থেকে যায়। (১২ ইউসুফঃ ১০৬)

কিছু নমুনাঃ মুসলিম ব্যক্তি শিরকের মত মহাপাপে জড়িয়ে কী ভাবে মুশরিক হয়ে যায় এর কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হল..

নমুনাঃ ১. আমাদের সমাজে অনেক মুসলিম এমন আছে যারা নামায পড়ে, রোজা রাখে, ধর্ম-কর্ম করার চেষ্টা করে, সাথে সাথে মাজারে সাজিদাহ করে, পীরের নামে নযর ও মান্নত করে, ইতযাদি। আসলে এসব কাজ মাজার পূজা ও পীর পূজারই নামান্তর। যে বা যারা এমন করে; এরা আসলে মুশিরক হয়ে যায়। কারণ সাজিদাহ করতে হয় শুধুই আল্লাহকে, নযর মান্নত করতে হয় শুধুই আল্লাহর নামে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে নযর বা মান্নত করা অথবা অন্যকে সাজিদাহ করা সুস্পষ্ট শিরক। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

সকল সাজিদাহর/ইবাদাতের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ। তাই আল্লাহর সাথে অন্যকে ডেকো না। (৭২ জিন্নঃ ১৮)	وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18)

নমুনাঃ ২. আমাদের সমাজে অনেক মুসলিম এমন আছে যারা নামায পড়ে, রোজা রাখে, সাথে সাথে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত ও মনগড়া আইন মেনে নেয় এবং মেনে চলে; আসলে এসব কাজও শিরকেরই নামান্তর। তাই এরাও মুশিরক হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ হলেন রাব্বু-ল-আ'লামীন, এ মহাবিশ্বের একমাত্র বৈধ বিধানদাতা ও নীতিনির্ধারক। সুতরাং আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত বা মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেওয়া শিরক। যে মুসলিম এমন করে সে মুশরিক হয়ে যায়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)

(হে মুহাম্মাদ!) তুমি (ও তোমার উম্মত) মানুষের মাঝে **"হুকম"** (বিচার, শাসন, আদেশ ও আইন) করবে আল্লাহর নাযিলকৃত নীতিমালা ও বিধান মেনে। আর সাবধান! মানুষের **আহওয়া** (মনগড়া) কোনোকিছুর অনুকরণ করবে না। বরং (যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া আইন, বিধান, নীতিমালা, মতবাদ, মতাদর্শ, ইত্যাদি বানায় বা মেনে নেয়) তোমরা তাদেরকে বর্জন করবে, যেন তারা আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। আর জেনে রাখো! (কেবল তারাই আল্লাহর বিধান থেকে বিরত থাকে) যাদেরকৃত পাপের কারণে তাদের সাজা দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। (আর মনে রাখবে) অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ। (প্রতি হাজারে মাত্র একজন হবে জান্নাতী আর ৯৯৯জন জাহান্নামী। বুখারীঃ তাফসীর অধ্যায়)

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন, বিধান, নীতিমালা। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্বীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি নীতিমালা ও বিধান বা শারীয়া'হ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসনব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হা'কিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নিরধারক)

আহওয়া পরিচিতিঃ আহওয়া শব্দটি হাওয়া শব্দের বহুবচন। হাওয়া অর্থ মানবরচিত, মনগড়া, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর রীতিনীতি ও বিধিবিধানের বিপরীতে যাকিছু আছে সবই হাওয়া।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত থেকে যেসব বিষয় বুঝতে পেলাম তা হল..

- বিচার ও শাসন করতে হবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মেনে,
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কারো মনগড়া নীতি, আদর্শ, দর্শন, আইন, বিধান, মতবাদ, মতাদর্শ, ইত্যাদি কোনোকিছুই মানা যাবে না,
- যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া নীতি, আদর্শ, দর্শন, আইন, বিধান, মতবাদ, মসলক, তরিকা, মিনহাজ, ইত্যাদি তৈরি করে এবং যারা এসব মেনে নেয় তাদের বর্জন করতে হবে,
- তাদের বর্জন না করলে তারা আল্লাহর বিধান থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করে ফেলবে,
- যারা আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা বিচ্যুত হয়ে যায় আল্লাহ্ তাদের সাজা দেন,
- দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ।

নমুনাঃ ৩. আমাদের সমাজে অনেক মুসলিম এমন আছে যারা নামায পড়ে, রোজা রাখে, সাথে সাথে নিজেদের আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, ইমাম ও নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে এবং আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়েও উনাদের কথা মেনে নেয়, যারা এমন করে এরাও মুশরিক হয়ে যায়। কারণ আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান ও নীতিমালার বিপরীতে অন্যকারো আনুগত্য মেনে নিলে তাকে রবের আসনে বসানো হয় যা শিরকেরই নামান্তর। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)

তারা (ইয়াহুদ নাসারা) আল্লাহ ছাড়াও তাদের আহবার ও রুহবানকে (উলামা ও পীরকে) রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে আর মাসীহ বিন মারইয়ামকেও (তথা নবীকেও।) অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল এক আল্লাহর ইবাদাত করতে। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (উল্লেখ্য ইয়াহুদ উলামাকে আহবার আর খৃষ্টান আবিদদেরকে রুহবান বলা হয়) (৯ তাওবাহঃ ৩১)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে হুযাইফাহ রা.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ ইয়াহুদ খৃষ্টান কি তাদের উলামা ও পীরদের পূজা করত? তিনি বলেছেনঃ না, (পূজা করত না। তবে) তারা (উলামা ও পীরগণ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত) হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বলে ফতোয়া দিলে মানুষ এটা মেনে নিত। আ'দি বিন হা'তীম বলেনঃ একদা আমি রাসূল সা.র কাছে এলাম। আমার গলায় তখন স্বর্নের ক্রস ছিল। তিনি বললেনঃ আ'দি! এটা কি? এ বেদিকে ফেলে দাও। তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেনঃ শোন! লোকজন তাদের পূজা করত না। বরং তারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করে ফতোয়া দিলে; মেনে নিত। (তাফসীত কুরতুবী, উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে।)

হুঁশিয়ারিঃ ভালোমন্দ, বৈধ-অবৈধ, করনীয়-বর্জনীয়, তথা জীবনবিধান নির্ণয় করা রাব্ব হিসেবে একমাত্র আল্লাহর কাজ। কারণ যিনি আমাদের জীবন বিধান নির্ণয় করেন তিনিই রাব্ব। আল্লাহ আমাদের একমাত্র রাব্ব। আল্লাহর ঠিক করা জীবন বিধানই আমাদের জন্য একমাত্র বৈধ বিধান। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো বানানো বিধান বা ফতোয়া মেনে নেওয়া শিরকেরই নামান্তর। এমন করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে (প্রভুত্বে) শিরক হয়।

আলীম, উলামা ও ইমাম মানাঃ আমরা অবশ্যই আলীম উলামা ও ইমামগণকে মান্য করব। তবে মনে রাখতে হবে উনাদের মান্য করারও একটা সীমারেখা রয়েছে। আমরা আলীমকে আলীম হিসেবে আর ইমামকে ইমাম হিসেবে মান্য করব, নবী হিসেবে নয়। আমাদের মনে রাখতে হবেঃ আলীম-উলামা, পীর-মাশায়েখ আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষক। আমরা উনাদেরকে শিক্ষক হিসেবে সম্মান করব, মর্যাদা দেব অবশ্যই। তবে উনারা আমাদের রাব্ব বা বিধানদাতা নন এবং নবীও নন। তাই আল্লাহর কিতাব বা রাসূল সাঃর সুন্নতের বিপরীতে কারো কথাই মেনে নেওয়া যাবে না। আর এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা, মাযহাবী ইমামগণের শিক্ষাও এটাই। ইমাম আবু-হানীফাহ, মালিক, শাফিয়ী' ও আহমাদ সবাই বলে গেছেন "আমার কথার বিপরীতে সাহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে তোমরা আমার কথা বাদ দিয়ে হাদীছকে আকড়ে ধরবে আর এটাই আমার শেষ কথা"।

পর্যালোচনাঃ ঈমান আনা সত্ত্বেও মানুষ কীভাবে শিরক করে মুশরিক হয়ে যায় এ ব্যাপারে মাত্র ৩টি নমুনা পেশ করা হল। এর আলোকে একটু ভেবে দেখুন তো আমাদের সমাজের কত পার্সেন্ট মানুষ এসব শিরকের সাথে জড়িত আছে এবং মুসলিম হয়েও কীভাবে তারা মুশরিক হয়ে যাচ্ছে? হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেফাজত কর!!

অনুচ্ছেদঃ ৫. শিরকের কিছু সূত্র বা পথ

মানব সমাজে শিরকের প্রচলন আদি কাল থেকেই। মানুষ স্থান কাল পাত্র ভেদে নানাভাবে, নানা পদ্ধতিতে শিরক করে থাকে, সহজভাবে বুঝার জন্য নিম্নে শিরকের কিছু সূত্র বা পদ্ধতি পেশ করা হল..

১. আল্লাহর কিতাব থেকে বিচ্যুতিঃ শিরকের প্রথম ধাপ "আল্লাহর কিতাব থেকে বিচ্যুতি"। যে বা যারা আল্লাহর কিতাব থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য পথে চলে যায় তারা সহজেই শিরকে জড়িয়ে যায়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (48)

হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আগত (নবী, দ্বীন ও কিতাবকে) সত্যায়নকারী যে কিতাব (আল-কুরআন) আমি নাযিল করেছি তোমরা এতে ঈমান আনো (একে মেনে নাও) নতুবা এমনো সময় আসবে যখন (অমান্যকারীদের) মুখায়ব বিকৃত করে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেব, অথবা লা'নত করব, যেমন লা'নত করেছিলাম শনিবারের (মৎস শিকারী) মানুষদের। আর (তোমরা তো জানো যে) আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়িত হবেই।

আল্লাহ তার সাথে কৃত শিরক কখনো ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া বাকি সব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল, সে মহাপাপ করল। (৪ নিসাঃ ৪৭-৪৮)

হুঁশিয়ারিঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা করা হবে এবং নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলঃ আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত অনেক মানুষ নানা ভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যে সব মুসলিম সমাজতান্ত্রিক ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলা আর সমাজতান্ত্রিকরা আল্লাহর বিধান মানে না, তাই তারা কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবন যাপন করছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে চলে।
- যে সব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব।
- যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজমকে মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সূদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিই সূদ।
- যে সব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিম জাতির জাতীয় ঐক্য আর তারা উম্মতকে বিভক্ত করে দলাদলি করে থাকেন।

সুতরাং হে আখেরাত মুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে আসি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সহায় হও।

২. মানবরচিত ও মনগড়া পথঃ শিরকের আরো একটি প্রধান সূত্র হল "মানবরচিত ও মনগড়া পথে চলা"। যে বা যারা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত ও মনগড়া পথে চলে যায় তারা সহজেই শিরকে জড়িয়ে যায়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88)

এটাই আল্লাহর পথ। আল্লাহ যাকে খুশী হেদায়াত দান করেন। কেউ যদি (আল্লাহর পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে গিয়ে) শিরক করে তবে তার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। (৬ আনয়া'মঃ ৮৮)

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22)

(হাশরের ময়দানে) চূড়ান্ত বিচারের পর শয়তান বলবেঃ (হে জিন্ন ও ইনসান!) আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এসবই ছিল সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আমি তোমাদেরকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম (এসব ছিল প্রতারণা। আমি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এসব পূর্ন করার সাধ্য আমার ছিল না।) তাই আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। (তবে আমি তোমাদেরকে বাধ্য করিনি।) তোমাদের উপর আমার কোনো কর্তৃত্বও ছিল না। আমি শুধু আহ্বান করেছি আর তোমরা নিজ থেকেই আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং আজ আমাকে তিরস্কার করো না, বরং নিজেকেই তিরস্কার কর। আজ আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না, তোমরাও আমাকে বাঁচাতে পারবে না। ইতোপূর্বে (আল্লাহর বিধানের বিপরীতে আমার কথা মেনে নিয়ে আমাকে বিধানদাতার আসনে বসিয়ে) তোমরা যে শিরক করেছ আজ আমি এসব প্রত্যাখ্যান করলাম। পাপিষ্ঠদের পরিণতি অবশ্যই যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিধানদাতা হিসেবে মেনে নেওয়া শিরক) (১৪ ইবরাহীমঃ ২২)

৩. প্রতিকৃতি থেকে মূর্তী আর মূর্তী থেকে দেবদেবীঃ শিরকের আরো একটি প্রধান সূত্র হল "প্রতিকৃতি থেকে মূর্তী আর মূর্তী থেকে দেবদেবী"। এ সূত্র ধরেই মানব সমাজে প্রথম শিরক শুরু হয়েছেছিল। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মানুষ প্রথমে তাদের আকাবীরদের /মুরব্বীদের /জাতীয় নেতাদের প্রতিকৃতি বা ভাস্কর্য স্থাপন করেছিল, পরে কালের আবর্তে এসব ভাস্কর্যই মূর্তী ও দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (24)

নূহ বললঃ হে রাব্ব! তারা (জনতা) আমার অবাধ্য হয়ে এমন লোকের (নেতার) আনুগত্য করছে যাদের সন্তান ও সম্পদ (ধনবল ও জনবল) তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা (ইসলামের বিরুদ্ধে) বড় বড় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করছে এবং (জনতাকে) বলছেঃ তোমাদের খোদাদেরকে ছেড়ে যেও না। ওয়াদ, সুয়া'দ, ইয়াগূ'ছ, ইয়াউ'ক্ব ও নাসরকে ছেড়ে যেও না। (এসব তাদের মনগড়া খোদার নাম) তারা (ইতোমধ্যেই) অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। (৭১ নূহঃ ২১-২৪)

পর্যালোচনাঃ প্রথম মানব সমাজ গড়ে উঠেছিল শামদেশের বর্তমান ফিলিস্তিন অঞ্চলের বাইতু-ল-মাক্বদিস (জেরুসালেম/জেরুজালেম) শহরে। আদম আ. ছিলেন এ সমাজের প্রধান নেতা ও প্রধান নির্বাহী। তিনি আল্লাহর বিধান মেনেই তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গড়ে ছিলেন, যে সমাজে আইনের মূল উৎস ছিল আল্লাহর দেওয়া নীতিমালা ও রাসূলের আদর্শ তথা ইসলামী শারীয়াহ। আদম আ.-র জীবদ্দশায়ই এ সমাজের সদস্য তিন হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর এটাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মানব সমাজ।

আদম আ.র পর উনার ছেলে হিবাতুল্লাহ (যিনি শীশ আ. নামে পরিচিতি) উনার খালীফাহ হিসেবে জাতির নেতৃত্বে আসীন হন। তিনিও আল্লাহর দেওয়া নীতিমালা ও রাসূলের আদর্শ মেনেই জাতিকে পরিচালিত করেন।

হিবাতুল্লাহর মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে শুরু হয় জ্ঞানহীন লোকদের নেতৃত্ব, যাদের আবেগে কাজ করে বেশী আর বিবেকে কম। সুযোগ বুঝে ইবলিস একদা তাদের কাছে এলো। সে তাদের পূর্বপুরুষ ওয়াদ, সুয়া'দ, ইয়াগূ'ছ, ইয়াউ'ক্ব ও নাসর সম্পর্কে এক আবেগময় ও দরদময় বক্তব্য রাখল। আগন্তুকের মুখে পুর্বপুরুষের আবেগময় স্মৃতিচারন শুনে নেতারা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল। ইবলিস বুঝল তার পরিকল্পনা কাজে এসেছে। ইবলিস সুযোগ বুঝে এসব মহা মানবদের প্রতিকৃতি বানিয়ে রাস্তার মোড়ে স্থাপন করে তাদেরকে চির স্মরনীয় করে রাখার উপদেশ দিল। আবেগে আপ্লুত নেতারা ভাবলঃ এমন করলে তো ভালোই হয়। কিন্তু প্রতিকৃতি বানাবে কে? ইবলিস বললঃ এ জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। তোমরা শুধু নীতিগতভাবে রাজি হলেই চলবে। বাকি কাজ আমিই করে দেব। নেতারা মহা খুশী হল। কিছু দিন পর ইবলিস ৫টি মুর্তী নিয়ে হাজির। নেতারা ইবিলসের কথা মত ৫ জন পূর্ব পুরুষের ৫টি মুর্তী ৫টি এলাকায় রাস্তার মোড়ে স্থাপন করল। কালের আবর্তে এরাই হয়ে গেল খোদা। এভাবেই মানব সমাজে প্রথম মুর্তীপূজা শুরু হয়। আরো বিস্তারিত জানতে "ক্বাস্বাস্বুন নাবিয়্যিন" বা অন্যান্য ইতিহাসের কিতাব পড়ে নিন।

৪. শুফায়া' থেকে শুরাকাঃ শিরকের আরো একটি প্রধান সূত্র হল "শুফায়া' থেকে শুরাকা"। শুফায়া' অর্থ সুপারিশকারীগণ আর শুরাকা অর্থ শরীকগণ, নানা কাজে যাদেরকে আল্লাহর শরীক হিসেবে মেনে নেওয়া হয় তাদেরকে এক কথায় বলা হয় "শুরাকা"। এ ব্যাপারে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। এসবের একটি হল..

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94)

(পরকালে আল্লাহ বলবেন) সবাই আজ একা একা এসেছ, যেমন প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম। (দুনিয়ায়) আমি যা দিয়েছিলাম সব তোমরা ফেলে এসেছ। কই? তোমাদের সঙ্গে তোমাদের (শুফায়া') শাফায়া'তকারীদের দেখছি না যে, যাদেরকে তোমরা (শুরাকা) আমার শরীক মনে করতে? (আজ) তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল, তোমাদের ধারনা ব্যর্থ হয়ে গেল। (৬ আনয়া'মঃ ৯৪)

শুফায়া' পরিচিতিঃ আরবী শদ শাফায়া'হ (আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারনে বলা হয় শাফায়াত) অর্থ সুপারিশ বা অনুরোধ। শাফি' অর্থ সুপারিশকারী আর শুফায়া' অর্থ সুরাপিশকারীগণ। হাশরের মাঠে বিচারের পর নবী, রাসূল, শাহীদ ও মুঅমিনগণ পাপিষ্ঠ মুসলিম তথা ফাসিকদের মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। এরই নাম শাফায়াত আর যারা সুপারিশ করবে তাদেরকে বলা হয় শুফায়া'। পরকালে শাফায়াত হবে শুধুই ফাসিক শ্রেণীর মুসলিমদের জন্য। কাফর বা মুনাফিকের জন্য শাফায়াতের সুযোগ থাকবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70)

যারা দ্বীনকে হাসি-তামাশায় পরিণত করেছে, পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে; (যারা এমন করে মুনাফিক হয়েগেছে) তাদেরকে (আল্লাহর হাতে) ছেড়ে দাও আর আল-কুরআন দিয়ে স্মরন করিয়ে দাও, যেন পাপের কারণে ধ্বংসে পতিত না হয়। (তারা যদি থেকে ফিরে না আসে তবে আখেরাতে) তারা কোনো ওয়ালী বা সুপারিশকারী পাবে না আল্লাহ ছাড়া। (তাদের এক ব্যক্তির জন্য দুনিয়ার) সবকিছু মুক্তিপণ হিসেবে দিলেও কোনো লাভ হবে না। নিজেদের পাপের জন্য এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এদের তরে হা'মীম (জাহান্নামের লাভা) আর যন্ত্রনাদায়ক আযাব। কারনঃ এরা কুফর করেছে। (৬ আনয়া'মঃ ৭০)

অনুচ্ছেদঃ ৬. শাফায়াত নিয়ে ভন্ডামী ও শিরকের পথে ধাবিত হওয়া

শাফায়াতের পূর্ণ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রন আল্লাহর হাতে। মহান আল্লাহ তায়া'লা আয়াতু-ল-কুরসীতে বলেছেন "কে আছে? আল্লাহর কাছে শাফায়াত করবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া"। আসলে পরকালে কে শাফায়াত করবে? কার জন্য শাফায়াত করবে? এসব ঠিক করবেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। তাই দুনিয়ায় থেকেই শাফায়াতকারী নির্ধারন

করে ফেলা আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপের শামিল। কিন্তু অনেকেই আবেগের বশে ভুল পথে গিয়ে প্রতারিত হয়। যেমন..

তখনকার মুশরিকরাঃ তখনকার দিনে আরবের মুশরিকরা মূর্তীপূজা করত, তারা ভাবতঃ এ মূর্তীগুলো আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। অর্থাৎ মূর্তীগুলোকে তারা আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার মাধ্যম মনে করে ভজন করত, যেন এরা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (18)

তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের দাসত্ব/ইবাদাত করছে এরা কারো কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। তারা বলেঃ এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করবে। জিজ্ঞেস করঃ তোমরা কী আল্লাহকে আসমান-যমীনের এমন কিছু জানাতে চাচ্ছ যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, সকল শিরকের উর্দ্ধে। (ইউনুসঃ ১৮)

আমাদের সমাজের হিন্দুরাঃ আমাদের সমাজের হিন্দুরাও এক ইশ্বর বিশ্বাস করে তবে তারা মনে করেঃ দুনিয়াতে ইশ্বরের যেসব অবতার রয়েছেন উনাদের মাধ্যমেই ইশ্বরের সান্নিধ্য হাসিল করতে হয়। তাইতো এসব অবতারের মূর্তী বানিয়ে এদের ভজন করে এদের মাধ্যমে ইশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টা করে।

এখনকার কিছু মুসলিমঃ আজকাল আমাদের কিছু মুসলিমও একই মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েগেছে। এরাও মনে করে "দুনিয়ায় আল্লাহর যেসব ওলী রয়েছেন উনাদের মাধ্যমেই আল্লাহর সান্নিধ্য হাসিল করতে হয়"। তাইতো উনাদের মূর্তী না বানালেও মাজার বানায়, পূজা না করলেও ভজনা করে (যা পূজারই শামিল) আর যারা মাজার বানায় না বা ভজনা করে না তারাও নিজের পীরকে সুপারিশকারী মনে করে যা সরাসরি আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপের শামিল। আর এটাই হল "শুফায়া' থেকে শুরাকা" হিসেবে শিরকের অন্যতম সূত্র। অথচ আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14)

যেদিন কিয়ামত সংঘঠিত হবে সেদিন পাপিষ্ঠরা হতাশ হয়ে পড়বে। তখন কোনো শুরাকাই (যাদেরকে তারা আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ মনে করে) তাদের জন্য শাফায়া'ত করবে না /করতে পারবে না। বরং তারা তাদের শুরাকাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। যেদিন কিয়ামত সংঘঠিত হবে সেদিন তারা (শুফায়া, শুরাকা ও জনতা) পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। (৩০ রূমঃ ১২-১৪)

পরিচ্ছেদঃ ৭. শিরক থেকে বেচে থাকার একমাত্র পথ

শিরক থেকে বেচে থাকার একমাত্র পথ হল "ইসলাম ছাড়া আর যত নীতি, আদর্শ, দর্শন ও মতবাদ রয়েছে; এ সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে একমাত্র ইসলামকেই নৈতিক, আদর্শিক ও বিধানগতভাবে মেনে নেওয়া ও মেনে চলা"। এ পদ্ধতিতে দ্বীন পালনের নামই হানীফ পদ্ধতি আর এমন মুসলিমকে বলা হয় "হানীফ মুসলিম" বা একনিষ্ঠ মুসলিম। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

.. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79)

..ইবরাহীম বললঃ হে আমার জাতি! তোমরা যেসব শিরক করছ এসবের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। আমি (একজন হানীফ মুসলিম হিসেবে) আমার মুখ একনিষ্ঠভাবে ওই সত্বার দিকে ঘুরিয়ে দিলাম যিনি আসমান যমীনের উদ্ভাবক। আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। (৬ আনয়া'মঃ ৭৮-৭৯)

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)

ইবরাহীম ইয়াহুদ ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না। সে ছিল হানীফ মুসলিম। সে (তোমাদের মত) মুশরিক ছিল না। ইবরাহীমের নিকটতম মানুষ হল (তার জীবদ্দশায়) যারা তাকে অনুকরণ করেছে এবং এই নবী (মুহাম্মাদ) আর মুঅমিনগণ। আল্লাহ মুঅমিনদের ওয়ালী। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৬৭-৬৮)

পরিচ্ছেদঃ ৮. শিরকের উপকরণ

যে ব্যক্তি বা বস্তু দ্বারা কোনো কাজ সম্পন্ন করা হয় ওই ব্যক্তি বা বস্তুকে এর উপকরণ হিসেবে গন্য করা হয়। যেমনঃ রান্নার উপকরন চুলা, লেখার উপকরণ খাতা-কলম, ইত্যাদি। সুতরাং যেসব ব্যক্তি বা বস্তু ব্যবহার করে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয় ওইসব ব্যক্তি বা বস্তুই শিরকের উপকরণ। কিছু মানুষ অজ্ঞতা বশত অনেককিছুকেই

শিরকের উপকরণ বানিয়ে ফেলেছে। যেমনঃ আল্লাহর ফিরিস্তা, নবী, রাসূল, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মূর্তী, ভাস্কর্য, মিনার, সৌধ, গাছ, বিভিন্ন বস্তু স্থান ও স্থাপনা, ইত্যাদি।

উপকরণঃ ১. ফিরিস্তাঃ ফিরিস্তা আল্লাহর এক মহান সৃষ্টি। ফিরিস্তা আল্লাহর অনুগত ও সম্মানিত জাতি। কিন্তু হতভাগা কিছু মানুষ এদেরকে শিরকের উপকরণ বানিয়ে ফেলেছে। তারা মনে করে; ফিরিস্তা আল্লাহর কন্যা। এমন মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক হয়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19)

(ফিরিস্তাকে আল্লাহর মেয়ে মনে করে) তারা আল্লাহর কিছু বান্দাকে আল্লাহর সত্বার অংশ বানিয়ে ফেলেছে। (এভাবেই) মানুষ সুস্পষ্ট কুফর করে থাকে। তবে কী তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে শুধু মেয়েদেরকে (সন্তান হিসেবে) গ্রহণ করলেন আর তোমাদের প্রাধান্য দিলেন ছেলে দিয়ে?

তারা রাহমানের জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারন করে অথচ তাদের কাউকে এমন সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখ মলিন হয়ে যায়, সে ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। (তাদের বিচারে) যে নারী সংগ্রামে অদক্ষ, অলংকারে সজ্জিত হয়ে জীবন যাপন করে (সে হয় আল্লাহর সন্তান, আর তাদের সন্তান হবে সুপুরুষ, দক্ষ যোদ্ধা। এ তাদের কেমন বিচার?)

আসলে ফিরিস্তা আল্লাহর বান্দা। তারা ফিরিস্তাদের নারী মনে করে। (তারা কেমন করে নিশ্চিত হল যে ফিরিস্তা নারী?) ফিরিস্তা সৃষ্টিকালে তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিল? (আসলে সবই তাদের মনগড়া মিথ্যাচার) তাদের এসব মিথ্যা বচন লিখে রাখা হচ্ছে। তাদেরকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। (৪৩ যুখরুফঃ ১৫-১৯)

ফিরিস্তা নিয়ে শিরকের ধরণঃ কোনো কালে কোনো জাতী বা গোত্র ফিরিস্তাদের পূজা করত বলে আমার জানা নেই। আসলে ফিরিস্তাদের নিয়ে শিরকের ধরনটা ছিল নীতিগত ও বিশ্বাসগত। কিছু মানুষ বিশ্বাস করত "ফিরিস্তারা আল্লাহর কন্যা" এবং তারা তাদের সমাজে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে বিষয়টি মেনে চলত। তবে আমাদের সমাজের কিছু মানুষ ফিরিস্তাদের আহবান করতে এবং তাদের কাছে সম্পদ কামনা করতে আমি দেখেছি।

ছোট বেলায় দেখেছিঃ আমাদের এলাকার একজন হুজুর আসরের পর আরো কয়েকজনকে নিয়ে মিকাঈল আ.কে আহবান করতেন, উনারা মনে করতেনঃ মিকাঈল আ. সম্পদ বিতরনকারী, উনি এলে সম্পদ দান করে যাবেন। এছাড়া জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও আজরাঈল, এসব ফিরিস্তার নামে তাবিজ লিখে দিতেও অনেক আলীমকে দেখেছি। এসকল কাজ আসলে শিরকেরই অন্তর্ভুক্ত।

উপকরণঃ ২. নবী ও রাসূলঃ নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা। মহান আল্লাহ সদয় হয়ে উনাদেরকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনিত করে মানব জাতির কল্যানে প্রেরন করে থাকেন। কিন্তু কিছু পাপিষ্ঠ মানুষ মাত্রাতিরিক্ত সম্মান দেখাতে গিয়ে নবী রাসূলকে শিরকের উপকরণ বানিয়ে ফেলেছে। এ বাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (30)

ইয়াহুদ বলে উ'জাইর আল্লাহর ছেলে আর নাসারা বলে মাসীহ আল্লাহর ছেলে। এসবই তাদের মুখের কথা। তারা আগেকার কাফিরদের মতই কথা বলছে। আল্লাহর ধ্বংস করুক। তারা কী সব রটনা করছে? (৯ তাওবাহঃ ৩০)

পর্যালোচনাঃ ফিরিস্তা বা কোনো নবী রাসূলকে আল্লাহর ছেলে বা মেয়ে মনে করা আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরকের শামিল। এমন শিরক করেছে আগেকার অনেক জাতি। আর তাদের অনুকরনে বর্তমানে আমাদের কিছু মানুষও মনে করে মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর নূরেরই অংশ। এটাও শিরকেরই নামান্তর।

নবী রাসূল নিয়ে শিরকের ধরণঃ নবী রাসূল নিয়ে শিরকের ধরনটাও আসলে নীতিগত ও বিশ্বাসগত। ইয়াহুদ ও খৃষ্টান বিশ্বাস করে "উজাইর আ. ও ঈসা আ. আল্লাহর ছেলে" আমাদের সমাজের কিছু মানুষও আজকাল এমন হয়ে গেছে, তারাও মুহাম্মাদ সা.-কে আল্লাহর অংশ মনে করে, নবীকে চিরন্তন মনে করে, নবীকে আহবান করে এবং নবীর কাছে প্রার্থনা করে থাকে।

উপকরণঃ ৩. উলামা ও পীরঃ উলামা, পীর, শায়েখ, ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ হলেন মুসলিম সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। উনারা দেশ, জাতি ও জনতাকে দ্বীন শিখাবেন, দ্বীনি উপদেশ দেবেন, আল্লাহ ও রাসূলের বানী প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু অভিশপ্ত মানুষ অতি উৎসাহী হয়ে আল্লাহর দেওয়া সীমানা লঙ্ঘন করে উনাদেরকেও শিরকের উপকরণ বানিয়ে ফেলেছে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)

তারা (ইয়াহুদ ও নাসারা) আল্লাহ ছাড়াও তাদের আহবার ও রুহবানকে (উলামা ও পীরকে) রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে আর মাসীহ বিন মারইয়ামকেও। অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিল এক আল্লাহর ইবাদাত করতে। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (উল্লেখ্য ইয়াহুদ উলামাকে আহবার এবং খৃষ্টান আবিদদেরকে রুহবান বলা হয়) (৯ তাওবাহঃ ৩১)

পর্যালোচনাঃ আলীম উলামা বা পীর মাশায়েখ আমাদের শিক্ষক এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। তবে উনাদের কেউওই আমাদের রাব্ব বা বিধানদাতা নয়। আমাদের রাব্ব হলেন একমাত্র আল্লাহ। আমরা আলীম উলামা ও মাথায়েখদের সম্মান করব, শ্রদ্ধা করব, তবে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে উনাদের কারো কথা মেনে নেব না। এটাই ইসলামের শিক্ষা। কিন্তু কিছু হতভাগা মানুষ তাদের উলামা ও পীর নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে উনাদেরকে রাব্বের আসন দিয়ে শিরকের উপকরনে পরিনত করে ফেলেন। যেমন করেছে ইয়াহুদ ও নাসারা। সুতরাং আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

উলামা ও পীর কেন্দ্রিক শিরকের ধরণঃ উলামা ও পীর কেন্দ্রিক শিরকের ধরনটা আসলে নৈতিক, আদর্শিক, বিশ্বাসগত ও বাস্তবে অনুশীলনীয়। ইয়াহুদ ও খৃষ্টান "তাদের আহবার ও রুহবান তথা উলামা ও পীরদেরকে বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিয়ে রাব্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল এবং বাস্তব জীবনে উনাদের ফতোয়া ও উপদেশকেই দ্বীন ও শরীয়ত মন করত, এমনকি আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে হলেও উনাদের ফতোয়া ও উপদেশ মেনে চলত" যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ তাওবাহর ৩১তম আয়াতে।
আজকাল আমাদের অনেক মানুষই এমন হয়ে গেছে। তারাও নিজেদের দলীয় উলামা, পীর ও শাইখদেরকে বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিয়ে রাব্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং বাস্তব জীবনে উনাদের ফতোয়া ও উপদেশকেই দ্বীন ও শারীয়ত মনে করে চলছে, মাঝে মাঝে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত হলেও মসলক বা মিনহাজের দোহাই দিয়ে উনাদের ফতোয়া ও উপদেশ মেনে চলছে"।

উপকরণঃ ৪. নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গঃ আমাদের যারা নেতা হন, দেশ ও জাতির জন্য যারা কাজ করেন; আমাদের উচিত উনাদের সম্মান করা, উনাদের জন্য দোয়া করা এবং উনাদের অবদানের কথা মনে রাখা। তবে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানশূন্য কিছু জ্ঞানপাপী অতি বাড়াবাড়ি করে উনাদের প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য ও মূর্তী বানিয়ে শিরকের পথ উন্মুচিত করে ওইসব নেতাদেরকে শিরকের উপকরনে পরিনত করে ফেলেন। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (24)

নূহ বললঃ হে রাব্ব! তারা (জনতা) আমার অবাধ্য হয়ে গেছে এবং এমন লোকের (নেতার) আনুগত্য করছে যাদের সন্তান ও সম্পদ (ধনবল ও জনবল) তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা (ইসলামের বিরুদ্ধে) বড় বড় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করছে এবং (জনতাকে) বলছেঃ তোমাদের খোদাদেরকে ছেড়ে যেও না। ওয়াদ, সুয়া'দ, ইয়াগূ'ছ, ইয়াউ'ক্ব ও নাসরকে ছেড়ে যেও না। (এসব তাদের মনগড়া খোদার নাম) তারা (ওই নেতারা ইতোমধ্যেই) অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। (৭১ নূহঃ ২১-২৪)
পর্যালোচনাঃ ওয়াদ, সুয়া'দ, ইয়াগূ'ছ, ইয়াউ'ক্ব ও নাসর; এরা আসলে তখনকার সমাজের বড় বড় নেতা ও মুরব্বীদের নাম। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে একটু উপরে শিরকের সূত্র পরিচ্ছেদের সূত্রঃ ২. দেখে নিন।

নেতা কেন্দ্রিক শিরকের ধরণঃ নেতা কেন্দ্রিক শিরকের ধরনটাও নৈতিক, আদর্শিক, বিশ্বাসগত ও বাস্তবে অনুশীলনীয়। আগেকার অনেক জাতি ও গোত্রই "তাদের নেতাদেরকে বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিয়ে রাব্বের আসন দিয়ে দিয়েছিল এবং বাস্তব জীবনে নেতাদের নীতিমালা ও বিধানকে জীবন আদর্শ ও জীবন বিধান হিসেবে মেনে চলত, তারা আল্লাহর বিধানের তোয়াক্কাই করত না"। আল-কুরআন যাকে "হাওয়া" মনগড়া বা মানবরচিত নীতি আদর্শ ও বিধান হিসেবে উল্লেখ করেছে। যে কথা বলা হয়েছে আল-কুরআনের অনেক আয়াতে। আজকাল আমাদের সমাজের প্রায় সকল মানুষই এমন হয়ে গেছে এবং দেশে দেশে একই নীতি মানা হচ্ছে। সবাই নিজ নিজ দেশের নেতাদেরকে বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিয়ে রাব্বের আসন দিয়ে দিয়েছে এবং বাস্তব জীবনে নেতাদের তৈরী আইন, বিধান, নীতিমালা, দর্শন ও আদর্শকেই জীবন আদর্শ ও জীবন বিধান হিসেবে মেনে চলছে।

উপকরণঃ ৫. মূর্তীঃ মূর্তীকে আরবীতে বলা হয় তামাছিল বা স্বোয়ার। তামাছিল অর্থ অনুলিপি বা অনুরূপ আর স্বোয়ার অর্থ প্রতিচ্ছবি, ভাস্কর্য, ফট, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর হুবহু নমুনাকে তামাছীল ও স্বোয়ার বলা হয় এবং উভয় শব্দ দ্বারা আবার মূর্তীও বুঝানো হয়। কোনো জিনিষের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য অথবা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য প্রতিকৃতি বা মূর্তী বানানো কিছু মানুষের স্বভাব। আর এ মূর্তী যদি হয় জাতীয় বা গোত্রীয়ভাবে কোনো মহান ব্যক্তির তবে শুরু হয় শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান প্রদর্শন, আর এ শ্রদ্ধা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে শুরু হয় পূজা ও ভজনা।
নূহ আ.-র আগমনের পূর্ব থেকে মানব সমাজে মূর্তী পূজা শুরু হয় এবং আমাদের উপমহাদেশীয় হিন্দুদের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত এ প্রথা চলমান আছে।

মূর্তী কেন্দ্রিক শিরকের ধরণঃ মূর্তী কেন্দ্রিক শিরকের ধরনটাও আসলে নৈতিক, আদর্শিক, বিশ্বাসগত ও অনুশীলনীয়। আগেকার অনেক জাতি ও গোত্র "তাদের মহান ব্যক্তিদের মূর্তী বানিয়ে গোত্রীয় বা জাতীয়ভাবে পূজা করত এবং পূজার ধরন হিসেবে নির্ধারিত দিবসে, এদের কাছে অবস্থান করত /এদের সামনে সাজিদাহ করত /বিশেষ ভঙ্গিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করত /এদের জন্য উৎসর্গ করত /ভেট বা ভোগ দিত" ইত্যাদি। যেমনটি করে থাকে আমাদের সমাজের হিন্দুরা। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54)

ইতোপূর্বেও আমি ইবরাহীমকে হেদায়াত দান করেছি। (আমি কাকে হেদায়াত করব আর কাকে করব না) এব্যাপারে আমি খুবই অবগত আছি। ইবরাহীম যখন তার পিতা ও জাতিকে বললঃ এসব তামাছীল (মূর্তী, প্রতিকৃতি) কী এবং তোমরা (কেন)

এদের কাছে অবস্থান কর? তারা বললঃ আমাদের পূর্বপুরুষরা এদের পূজা করত (তাই আমরাও করছি।) ইবরাহীম বললঃ তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছ। (২১ আম্বিয়াঃ ৫১-৫৪)

অন্য আয়াতে এসেছে..

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77)

বলো! তোমরা কেন আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদাত কর, যারা তোমাদের উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে সক্ষম নয়? অথচ আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। বলো! হে আহলে কিতাব! দ্বীনি ব্যাপারে অবৈধ বাড়াবাড়ি করো না, আর কারো "আহওয়া"র (মনগড়া নীতি, আদর্শ, আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শনের) অনুকরণ করো না, কারন (মনগড়া পথে চলে) তারা আগ থেকেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (৫ মাইদাহঃ ৭৬-৭৭)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়ঃ
১-মূর্তী পূজা, ব্যক্তি পূজা, বস্তু পূজা সবই শিরক।
২- ধর্মীয় ভাবে অধিক বাড়াবাড়ি থেকে শিরকের সূচনা হয়।

পর্যালোচনাঃ মূর্তী পূজা বা মূর্তী কেন্দ্রিক শিরক নানা সমাজে নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- নির্ধারিত দিনে মূর্তীর কাছে হাজির হয়ে নির্ধারিত কোনো পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, প্রার্থনা করা
- মূর্তীকে উদ্দেশ্য করে কোনোকিছু উৎসর্গ করা অথবা ভোগ বা ভেট দেওয়া
- মূর্তীকে সিজদাহ করা বা মূর্তীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে মূর্তীর সামনে মাথা নত করা
- নির্ধারিত নিয়মে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্য মূর্তীকে প্রদক্ষিন করা, ইত্যাদি নানা নিয়মে ও নানাভাবে মূর্তী পূজা করা হয়।

উল্লেখ্য আমাদের সমাজে মূর্তীকে সাধারনত ৩ নামে নাম করন করা হয়। যেমন..

- নর মূর্তী বা নর আকৃতিকে বলা হয় দেব
- নারী মূর্তী বা নারী আকৃতিকে বলা হয় দেবী
- জড় মূর্তী বা জড় আকৃতি তথা নরও নয়, নারীও নয় এমন আকৃতিকে বলা হয় বেদী

উপকরণঃ ৬. ভাস্কর্য, মিনার, সৌধ, গাছ, বিভিন্ন বস্তু স্থান ও স্থাপনাঃ জাতীয়ভাবে বা সামাজিকভাবে সম্মান করার জন্য, শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য, বিশেষ উৎসবে পশু বলি বা জবেহের জন্য অথবা ভোগ বা ভেট দেওয়ার জন্য যেসব ভাস্কর্য, মিনার, সৌধ, গাছ, স্থান বা স্থাপনাকে নির্ধারন করা হয় আরবীতে এক শব্দে এগুলোকে বলা "নুস্বুব" যার বহুবচন হল "আনস্বাব"। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) মদ (মাদক) জোয়া, **আনস্বাব** ও আযলাম (ভাগ্যতীর/লটারি) পাপ, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা অবশ্যই এসব বর্জন করবে, এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (৫ মা-ইদাহঃ ৯০)

আনস্বাব পরিচিতিঃ আনস্বাব শব্দটি নুস্বব এর বহুবচন। জাতীয় বা গোত্রীয়ভাবে সম্মান করা হয়; এমন সব আকৃতি, স্থান, স্থাপনা, বস্তু বা সৌধকে নুস্বব বলা হয়। রাসূল সা.র আগমনকালে মক্কাতে ৩৬০টি নুস্বব ছিল। ইসলামী বিধানে স্থাপনা তিন প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ

- দিক নির্দেশনার জন্য তৈরি স্থাপনা। জনকল্যাণে ব্যবহৃত এসব স্থাপনাকে আ'লাম বলা হয় আবার নুস্বুবও বলা হয়। এমন স্থাপনা তৈরি করা উত্তম ও কল্যাণকর। (দেখুন সূরাহ মায়ারিজঃ ৪৩)
- সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধনে বানানো স্থাপনাকে বলা হয় মিনার, আবার নুস্বুবও বলা হয়। মিনার বানানো অপচয় তবে মসজিদের শোভা বর্ধনে মিনার বানানো বৈধ ও ভালোকাজ।
- জাতীয় বা গোত্রীয়ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মর্যাদার প্রতীক হিসেবে যেসব সৌধ, মিনার, বস্তু বা স্থাপনা তৈরি বা নির্ধারণ করা হয় এগুলোকে বলা হয় নুস্বুব। সাধারণত মুর্তি, মিনার, পাথর, স্থান, স্থাপনা, গাছ বা অন্য কোনো বস্তুকে নুস্বুব হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- অনেকেই নুস্বুবকে শিরকের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন, তাই নুস্বুব বানানো মোটেই উচিত নয়। আর কোনো নুস্বুবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, নুস্বুবে উৎসর্গ করা, ভোগ দেয়া শিরক। নুস্বুবে জবেহকৃত পশুপাখি খাওয়া হারাম।

..আর যেসব পশুপাখি নুস্বুবে জবেহ করা হয়েছে.. (এগুলো খাওয়াও হারাম) (৫ মা-ইদাহঃ ৩)	وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

আনস্বাব কেন্দ্রিক শিরকের ধরণঃ আনস্বাব তথা ভাস্কর্য, মিনার, সৌধ, গাছ, বস্তু, স্থান ও স্থাপনা কেন্দ্রিক শিরকের ধরনটা নৈতিক, আদর্শিক, বিশ্বাসগত ও অনুশীলনীয়। আগেকার অনেক জাতি ও গোত্রই এসব আনস্বাব নির্মান ও নির্ধারন করে রাখত আর নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত নুস্বুবে হাজির হয়ে বিশেষ নিয়মে শ্রদ্ধা নিবেদন করত, বিশেষ ভঙ্গিতে দাড়িয়ে বা বসে বিশেষ কিছু পাঠ করত, ধর্মীয় উৎসবের পশুগুলো এসব স্থানে জবেহ করত, এসব স্থান, স্থাপনা ও বস্তুর সামনে ভোগ বা ভেট দিত, ইত্যাদি।
বর্তমানে আমাদের সমাজের হিন্দুরা এমনটি করে থাকে, তারাও নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত নুস্বুবে গিয়ে বিশেষ নিয়মে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, বিশেষ ভঙ্গিতে দাড়িয়ে বা বসে বিশেষ কিছু পাঠ করে, ধর্মীয় উৎসবের পশুগুলো এসব স্থানে গিয়ে বলি দেয়, এসব স্থান, স্থাপনা ও বস্তুর সামনে ভোগ বা ভেট দেয়, ইত্যাদি।

উপকরণঃ ৭. নানা বস্তুঃ আদিকাল থেকেই কিছু মানুষ শিরকের উপকরন হিসেবে চন্দ্র, সূর্য, সাগর, পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, পশু, ইত্যাদি নানা প্রকার বস্তু ও জীবজন্তুকে ব্যবহার করে আসছে। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26)

(সুলাইম আ.র গোয়েন্দা পাখি হুদহুদ বলল) আমি দেখেছি ওই নারী (ইয়ামনের রানী বিলকিস) ও তার জাতি আল্লাহর বদলে সূর্যকে সিজদাহ করে, শয়তান তাদের এ কাজকে শোভিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিরত রেখেছে, যেন তারা সঠিক পথ না পায়, যেন তারা আল্লাহকে সিজদাহ করতে না পারে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সকল গোপন রহস্য বের করে আনেন। অথচ মানুষ যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে সকল ব্যাপারেই তিনি অবগত। (তিনিই) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি। (২৭ নামলঃ ২৪-২৬)

বস্তু কেন্দ্রিক শিরকের ধরণঃ বস্তু কেন্দ্রিক শিরকের ধরণটাও নৈতিক, আদর্শিক, বিশ্বাসগত ও অনুশীলনীয়। আগেকার অনেক জাতি ও গোত্রের মাঝে বস্তু কেন্দ্রিক শিরকের প্রচলিন ছিল। তারা চন্দ্র, সূর্য, সাগর, পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, পশু, ইত্যাদি নানা বস্তু ও জীবজন্তুর উপাসনা ও নানাভাবে পূজা আর্চনা করত।
বর্তমানেও আমাদের সমাজের হিন্দুরা এমনটি করে থাকে, তারাও ধরিত্রি মাতা, দেশ মাতা, সূর্য মামা, চাদ মামা, গো মাতা, গঙ্গা মাতা, বাঘ মামা, নাগিনী, বট বৃক্ষ, ইত্যাদি বস্তুর পূজা করে। আর এসব পূজার ধরন হিসেবে তারা নানাভাবে ও নানা ভঙ্গিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিশেষ মন্ত্র পাঠ করে থাকে।

পরিচ্ছেদঃ ৯. আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক

জাতি বা সত্বাগতভাবে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহর সত্বার সাথে অন্য কেউ বা অন্যকিছুই সংযুক্ত নয়। আল্লাহর ছেলে নাই, মেয়ে নাই, পরিবার নাই, কেউ নাই। এমনকি আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ নাই। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে আয়াত বিদ্যমান আছে। যেমন..

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

বলো! আল্লাহ এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ হলেন স্বামাদ (অমুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত, প্রয়োজনমুক্ত, শাশ্বত, চিরন্তন।) তিনি কারো জনক নন, তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তার সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই /কিছুই নেই। (১১২ সূরাহ আল-ইখলাস্ব)

জাতিসত্বায় শিরকের নমুনাঃ খৃষ্টানরা মনে করে ঈসা আ. আল্লাহর ছেলে আর ইয়াহুদ মনে করে উজাইর আ. আল্লাহর ছেলে আর তখনকার দিনে কিছু মানুষ মনে করত ফিরিস্তা আল্লাহর মেয়ে। এসবই হল আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (30)

ইয়াহুদ বলে উ'জাইর আল্লাহর ছেলে আর নাসারা বলে মাসীহ আল্লাহর ছেলে। এসবই তাদের মুখের কথা। তারা আগেকার কাফিরদের মতই কথা বলছে। আল্লাহর ধ্বংস করুক। তারা কী সব রটনা করছে? (৯ তাওবাহঃ ৩০)

অন্যত্র বলা হয়েছে..

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57)

(আরবের কিছু মানুষ মনে করত ফিরিস্তা আল্লাহর মেয়ে। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারন করে অথচ আল্লাহ এসবের উর্দ্ধে। আর তাদের জন্য (পছন্দ করে) তাদের চাহিদা মত (পুত্র সন্তান) (১৬ নাহ'লঃ ৫৭)

জাতি সত্তায় শিরক তখন ও এখনঃ ইয়াহুদ ও খৃষ্টান তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলকে সম্মান করতে গিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে শিরক করেছে। তারা আল্লাহর নবীকে আল্লাহর ছেলে হিসেবে মেনে নিয়ে শিরকে জড়িয়েছে। তখনকার কিছু মানুষ ফিরিস্তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে হিসেবে মেনে নিয়ে আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক করেছে।
হাদীছে বলা হয়েছে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের প্রতিটি পদক্ষেপেই এ উম্মতের একদল মানুষ তাদের অনুকরণ করবে। বর্তমান উম্মতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাইঃ আমাদের একদল মানুষও আল্লাহর রাসূল সা.কে কান্ডজ্ঞানহীনভাবে অতি বাড়াবাড়ি করে তাকে আল্লাহর নূরের অংশ বানিয়ে এমন শিরকে জড়িয়ে পড়েছে। তারা মনে করছে আল্লাহর নবী আল্লাহর নূরেরই অংশ বিশেষ এবং তিনি আলিমু-ল-গাইব এবং হাজির নাযির তথা সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা।

আসল বাস্তবতাঃ কিন্তু আসল বাস্তবতা হলঃ ঈসা আল্লাহর ছেলে নয়, উজাইরও আল্লাহর ছেলে নয়, ফিরিস্তাও আল্লাহর মেয়ে নয়, মুহাম্মাদ সা. ও আল্লাহর নূরের অংশ নয়। বরং এরা সবাই আল্লাহর বান্দা, রাসূল এবং সম্মানিত ফিরিস্তা। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27)

তারা (ইয়াহুদ নাসারা) বলেঃ রাহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি এসবের ঊর্ধ্বে। আসলে এরা (ঈসা ও উজাইর) হল তাঁর দাসদের মাঝে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। এরা (ঈসা, উজাইর বা ফিরিস্তা) কেউই আল্লাহর কথার উপর কথা বলেনি। বরং তিনি যা আদেশ করেছেন এরা তাই করেছে। (২১ আম্বিয়াঃ ২৬)

পরিচ্ছেদঃ ১০. উলুহিয়্যাতে শিরক

যিনি মহান সৃষ্টিকর্তা, শর্তহীনভাবে যার দাসত্ব উপাসনা ও ইবাদাত করা হয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলতে হয়, যার কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়, যিনি পাপের সাজা ও পূন্যের পুরস্কার দেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন, যার মালিকানা হয় সার্বভৌম আর ক্ষমতা হয় নিরঙ্কুশ, যিনি সকল কিছুর উৎস, তিনিই ইলাহ। আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া।

ইসলামের মূল ভিত্তি; তাওহীদ তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদ আর তাওহীদের মূল বানী "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মানে নেই কোনো ইলাহ এক আল্লাহ ছাড়া। এ সাক্ষ্যর অর্থ দাড়ায়..

- নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মানবরচিত সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এক আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া।
- এক আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থাৎ নীতি, আদর্শ ও বিশ্বাসে অবিচল থাকার পর বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান ও রীতিনীতি নৈতিকভাবে মেনে নেওয়া ও বাস্তবে মেনে চলা
- আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমনকিছু না করা

উল্লেখ্য..

- আল্লাহ রাসূল ও ইসলাম বিরোধী সকল অপশক্তিকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে বিসর্জন দেওয়ার নাম "ত্বাগূত বর্জন"। ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্বশর্ত। যে মুসলিম ত্বাগূত বর্জন করল না তার ঈমান গ্রহনযোগ্য নয় আর ঈমান গ্রহনযোগ্য না হলে আ'মাল ও ইবাদাত কোনো কাজেই আসে না।
- আল্লাহর দেওয়া নীতি, আদর্শ ও বিশ্বাসে অবিচল থাকার নাম ঈমান।
- বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও বিধিবিধান মেনে চলার নাম আ'মাল। সঠিক ঈমান ও সঠিক আমলের অধিকারী ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম তথা মুঅমিন।

আর এ সাক্ষ্যর ২য় অংশ হল; মুহাম্মাদ সা.কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া অর্থাৎ সাক্ষ্যির ১ম অংশে উল্লেখিত সকল বিষয় পালন করতে গিয়ে একমাত্র অনুকরনীয় আদর্শ ও নমুনা হিসেবে মুহাম্মাদ সা.-র অনুকরণ করা।

আল্লাহ আমাদের মালিক আর আমরা আল্লাহর দাস, তাই বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে এক আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া ও মেনে চলাই উলুহিয়্যাতে তাওহীদের মূল কথা। আর এর বিপরীতে যা কিছু ঘটবে সবই শিরক। উলুহিয়্যাতে শিরকের কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হল..

নমূনাঃ ১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা করাঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা, আর্চনা, আরাধনা বা ভজন করা, ইত্যাদিকে আরবীতে বলা হয় ইবাদাত। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করা শিরক আর যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয় মুশরিক। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করছে এরা কারো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না.. (১০ ইউনুসঃ ১৮)	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

পূজার নমুনা ও পদ্ধতিঃ আসলে ইবাদাত বা পূজা করার নমুনা ও পদ্ধতি অনেক। এসবের মাঝে যে কোনো একটি আল্লাহ ছাড়া অন্য ব্যক্তি বা অন্য বস্তুর জন্য নিবেদন করলেই শিরক হবে। যেমন..

১. সালাত আদায়কালে আমরা বিশেষ সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দাড়িয়ে বা বসে থাকি এবং বিশেষ কিছু পাঠ করি আর এসবই মহান আল্লাহর জন্য নিবেদন করি। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে দাড়িয়ে বা বসে বিশেষ কিছু পাঠ করলে শিরক হবে।

২. আমরা মহান আল্লাহকে সিজদাহ করি, রুকু করি। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য রুকু করলে বা সিজদাহ করলে শিরক হবে।

৩. হাজ্জে আমরা নির্ধারিত দিনে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করি আর এটা করি আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে। সুতরাং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কোনো বিশেষ স্থান কাল বা বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নির্ধারিত দিনে সেখানে অবস্থান করলে শিরক হবে।

৪. হাজ্জে আমরা বিশেষ নিয়মে আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিন করি আর এটা করি আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে। সুতরাং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কোনো বিশেষ স্থান কাল বা বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রদক্ষিন করলে শিরক হবে।

৫. রোজা রাখতে গিয়ে আমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য খাদ্য, পানীয় ও যৌন সম্ভোগ বর্জন করি আর এটা করি আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে। সুতরাং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কোনোকিছুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কোনোকিছু বর্জন করলে শিরক হবে।

৬. কুরবানীতে আমরা পশু জবাই করে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করি আর এটা করি আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে। সুতরাং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া অন্যের জন্য কোনোকিছু উৎসর্গ করলে শিরক হবে। এসবই হবে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরিক।

নমূনাঃ ২. আল্লাহর সার্বভৌমত্বে অন্যকে শরীক করাঃ আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর সার্বভৌমত্বে অন্যকে শরীক করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের মালিকানাকে সার্বভৌম মনে করা শিরক। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন..

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120)

আসমানসমূহ, যমীন এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুর সার্বিক মালিকানা আল্লাহর, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (৫ মা-ইদাহঃ ১২০)

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হল বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- পক্ষান্তরে যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হল সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক এবং সার্বভৌম।

উলুহিয়্যাতে শিরকের নমুনা ও পদ্ধতিঃ উলুহিয়্যাহ অধিক ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়, সার্বভৌমত্ব, দাসত্ব, উপাসনা, ক্ষমা করা, তাওবাহ কবুল করা, উৎসর্গ করা, জবেহ করা, ইত্যাদি অনেক কিছুই উলুহিয়্যাতের সাথে জড়িত। সে মতে..

- সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্যের মালিকানাকে সার্বভৌম মনে করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হবে।
- দাসত্ব করতে হয় শুধুই আল্লাহর। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্যের দাসত্ব করা শিরক হবে।
- উপাসনা করতে হয় শুধুই আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত, উপাসনা, পূজা বা ভজন করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হবে।
- পাপ বা অপরাধ ক্ষমা করার মূল অধিকারী হলেন আল্লাহ তায়া'লা। তাই আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে কারো কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হবে।
- তাওবাহ কবুল করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ তায়া'লা। তাই আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে অন্যের কাছে তাওবাহ করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হবে।
- কুরবানী তথা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য কোনোকিছু উৎসর্গ করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ তায়া'লা। বান্দা যখন যা উৎসর্গ করে সবই করবে আল্লাহর নামে। তাই আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে অন্যের নামে উৎসর্গ করলে শিরক হবে।
- জীবন দেওয়ার মালিক আল্লাহ, জীবন নেওয়ার মালিকও আল্লাহ। তাই কোনো পশু বা পাখি জবেহ করতে হলে আল্লাহর নামে করতে হবে, এটা উলুহিয়্যাতের দাবী। সুতরাং আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে অন্যের নামে জবেহ করলে শিরক হবে।
- সকল ইজ্জম সম্মানের একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহর। তাই অন্যকে এতোটুকু সম্মানই দিতে হবে যতটুকু দিতে আল্লাহ অনুমোতি দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার বাইরে গিয়ে আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলকে অধিক সম্মান দিতে গিয়ে শিরকের মত পাপে জড়িয়েছে ইয়াহুদ ও নাসারা। তাই নবীকে নবীর মতই সম্মান দিতে হয় হবে; খোদার মত নয়, আলীম উলামা ও ইমামকে সে মতেই সম্মান দিতে হবে; নবীর মত নয়। কোনো নবী, ইমাম বা আলীমকে সম্মান দিতে গিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে খোদার আসনে বসিয়ে দিলে শিরক হবে আর উলামা /ইমামকে নবীর আসনে বসিয়ে দিলে কুফর হবে।

এখানে মাত্র দুটি নমুনা পেশ করা হল। এ ছাড়াও আমাদের সমাজে আরো নানাভাবে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক করা হয়।

পরিচ্ছেদঃ ১১. আল্লাহর হা'কিমিয়্যাতে শিরক

মহান আল্লাহ তায়া'লা তার সত্বাগত ও গুণগত সকল বিষয়েই এক ও অদ্বিতীয়, এরই নাম তাওহীদ। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে যা আছে সবই শিরক। হাকিমিয়্যাহ শব্দটি এসেছে "হুকম" শব্দ থেকে। আর "হুকম" শব্দটি সাধারনত আদেশ, বিধান, বিচার, শাসন, নীতিনির্ধারণ, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে মতে তাওহীদ হাকিমিয়্যাহ এবং হাকিমিয়্যাতে শিরক এর অর্থ দাড়ায়..

- আদেশ দেওয়ার বা অধ্যাদেশ জারি করার একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ তায়া'লা। অন্য কেউ যদি আদেশ দিতে চায় বা অধ্যাদেশ জারি করতে চায় তবে অবশ্যই এটা করতে হবে আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে কাউকে আদেশ দেওয়া বা কোনো অধ্যাদেশ জারি করা অবৈধ আর এসব আদেশ বা অধ্যাদেশকে নীতিগতভাবে বৈধ মনে করলে আল্লাহর হা'কিমিয়্যাতে শিরক হবে।
- আইন ও বিধান দেওয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন আল্লাহ তায়া'লা। অন্যকেউ কোনো আইন বা বিধান তৈরি করতে হলে অবশ্যই এটা করতে হবে আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে কোনো আইন বা বিধান তৈরি করা অবৈধ হবে আর এসব আইন বা বিধানকে নীতিগতভাবে বৈধ মনে করলে আল্লাহর হা'কিমিয়্যাতে শিরক হবে।
- বিচার ও শাসনের একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন আল্লাহ তায়া'লা। অন্যকেউ যদি বিচার বা শাসন করতে চায় তবে অবশ্যই এটা করতে হবে আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে মনগড়া আইনে বিচার বা শাসন করা অবৈধ হবে আর এসব অবৈধ বিচার বা শাসনকে নীতিগতভাবে বৈধ মনে করলে আল্লাহর হা'কিমিয়্যাতে শিরক হবে।
- নীতি নির্ধারনের একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন আল্লাহ তায়া'লা। অন্যকেউ কোনো ব্যাপারে নীতিমালা ঠিক করতে চাইলে অবশ্যই এটা করতে হবে আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে নীতি নির্ধারন করা বা কোনো ব্যাপারে নীতিমালা ঠিক করা অবৈধ হবে আর এসব অবৈধ কাজকে নীতিগতভাবে বৈধ মনে করলে আল্লাহর হা'কিমিয়্যাতে শিরক হবে।

তাইতো আল্লাহকে বলা হয় "আহ'কামু-ল-হা'কিমীন" তথা সর্বোচ্চ আদেশদাতা, সর্বোচ্চ বিধানদাতা, সর্বোচ্চ বিচারক ও শাসক, সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারিক" ইত্যাদি। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45)

নূহ ডেকে বললঃ হে রাব্ব! ছেলে আমার "আহল" (পরিবার, তাকে রক্ষা কর) নিশ্চয় তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমিই আহকামু-ল-হা'কিমীন তথা সর্বমহান হুকমদাতা। (১১ হূদঃ ৪৫)

আল্লাহ কি আহকামু-ল-হাকিমীন নন ? (৯৫ ত্বীনঃ ৮)	أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26)

তিনি ব্যতীত তাদের কোনো ওয়ালী নেই। আর তিনি তদীয় হুকমে কাউকে **শরীক** করেন না। (১৮ কাহাফঃ ২৬)

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটাই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটাই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্বীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়া'হ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হা'কিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক)

"আল্লাহ্ তদীয় হুকমে কাউকে শরীক করেন না" এর অর্থ দাঁড়ায়..

- আদেশ দেওয়ার বা আদেশ জারি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর অনুমতি বা অনুমোদন ছাড়া কেউ কাউকে আদেশ দিতে পারবে না বা আদেশ জারি করতে পারবে না। আমরা যদি কাউকে কোনো আদেশ দিতে চাই বা কোনো আদেশ জারি করতে চাই তবে এটা করতে হবে আল্লাহর বিধান মেনে আল্লাহর রেফারেন্সে।
- আইন বা বিধান দেওয়ার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ্। আল্লাহর অনুমতি বা অনুমোদন ছাড়া কোনো আইন বা বিধান তৈরি করা যাবে না। আমাদেরকে কোনো আইন বা বিধান তৈরি করতে হলে আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে এবং আল্লাহর রেফারেন্সে করতে হবে।
- বিচার ও শাসন করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ্। আল্লাহর অনুমতি বা অনুমোদন ছাড়া কোনো প্রকার বিচার বা শাসন করা যাবে না। আমাদেরকে কোনো বিচার বা শাসন করতে হলে আল্লাহর দেওয়া আইন বিধান ও নীতিমালা মেনে এবং আল্লাহর রেফারেন্সে করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ওয়ালী পরিচিতিঃ ওয়ালী অর্থ নীতিনির্ধারক, কর্তৃত্বশীল, অভিভাবক, মিত্র, দায়িত্বশীল, ইত্যাদি। ওয়ালী সম্পর্কে আল-কুরআনে যেসব কথা বলা হয়েছে এর সারসংক্ষেপ হল..

১. আল্লাহ সকল মুঅমিনের ওয়ালী। (বাক্বারাহঃ ২৫৭) এর মানে হচ্ছে আল্লাহ সকল মুঅমিনের জন্য একমাত্র কর্তৃত্বশীল নীতিনির্ধারিক।

২. আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ওয়ালী নেই। (বাক্বারাহঃ ১০৭) এর মানে হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে কর্তৃত্বশীল বা নীতিনির্ধারক হিসেবে মানা যাবে না। মানলে শিরক হবে।

৩. এক মুঅমিন অন্য মুঅমিনের ওয়ালী। (তাওবাহঃ ৭১) এর মানে হচ্ছে দুনিয়ার সকল মুঅমিন অন্য মুঅমিনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

৪. কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানানো যাবে না। (নিসাঃ ১৪৪) এর মানে হচ্ছে কোনো কাফিরকে অভিভাবক বা মিত্র বানানো যাবে না।

৫. যে সব মুসলিম আত্মীয়-স্বজন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসবে তাদেরকে ওয়ালী হিসেবে গ্রহন করা যাবে না। (তাওবাহঃ ২৩) এর মানে হচ্ছে তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না।

কর্তৃত্বে শিরকের কিছু নমুনাঃ আল্লাহ হলেন "আহ'কামু-ল-হা'কিমীন" তথা সকল কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ অধিকারী। অন্য সকলের কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর নীতিমালার আওতাধীন থেকে। আল্লাহর নীতির বাইরে কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং কারো কোনো কর্তৃত্ব মানা যাবে না। কিন্তু মানুষ নানাভাবে আল্লাহর কর্তৃত্বে শিরক করে থাকে। যোগে যোগে মানুষ কীভাবে আল্লাহর কর্তৃত্বে শিরক করে আসছে নীচে এর কিছু নমুনা পেশ করা হল..

নমুনাঃ ১. মানুষের উপর মানুষের শ্রেষ্টত্বঃ সকল কর্তৃত্বের মালিক আল্লাহ। তাই একমাত্র আল্লাহই পারেন কোনো ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির উপর শ্রেষ্টত্ব দিতে, এমন কর্তৃত্ব অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। আমাদেরকে ঈমান শিক্ষা দিতে গিয়ে সূরাহ বাক্বারাহ এর ২৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছে "আমরা রাসূলদের মাঝে বিভাজন তৈরি করি না"। আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত বুখারীর (৪৬০৪ তম) হাদীছে রাসূল সা. বলেছেন "যেব্যক্তি বললঃ আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস বিন মাত্তা থেকে শ্রেষ্ট সে মিথ্যা বলল"। সূরাহ বাক্বারাহ এর ২৫৩তম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন "এই হল রাসূলগন, আমি এদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছি"।

মূলকথা হল আমাদেরকে এমন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি তাই আমরা কাউকে শ্রেষ্টত্ব দিতে পারব না, তবে আল্লাহ হলেন সকল কর্তৃত্বের মালিক, তাই তিনি যাকে ইচ্ছা শ্রেষ্টত্ব দিতে পারবেন। সুতরাং আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্টত্ব দিলে আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করা হয়। যেমনটি করেছিল তখনকার মুশরিক নেতারা। তারা কুরআন নাযিলের জন্য মুহাম্মাদ সা.-র চেয়ে অন্য দুই ব্যক্তিকে শ্রেষ্টত্ব দিয়েছিল। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32)

তারা আরো বললঃ এ কুরআন দুই শহরের (মক্কা বা তাইফের) কোনো মহান ব্যক্তির উপর নাযিল হলো না কেন? (অর্থাৎ কার প্রতি কিতাব নাযিল হবে? এটাও তারা নির্ধারণ করে) তবে কি প্রভুর রহমত (নবুয়ত, ওহী) তারাই বন্ঠন করে (তারা যাকে মনোনয়ন দেবে আল্লাহ তাকেই নবী বানাবেন?) অথচ তাদের দুনিয়ার জীবিকাটাও আমি বন্ঠন করি। (দুনিয়ার সম্পদে) আমি কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দেই যাতে তারা একে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। (তবে তুমি এসব নিয়ে চিন্তা করো না) তারা যা জমা করছে তোমার প্রভুর দয়া (হেদায়াত ও জান্নাত) এসবের চেয়ে অনেক উত্তম (যা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে।) (৪৩ যুখরুফঃ ৩১-৩২)

নমুনাঃ ২. সময়ের উপর সময়ের শ্রেষ্টত্বঃ সকল কর্তৃত্বের মালিক আল্লাহ। তাই একমাত্র আল্লাহই পারেন কোনো সময়কে অন্য সময়ের উপর শ্রেষ্টত্ব দিতে, এমন কর্তৃত্ব অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু তখনার দিনে মক্কার মুশরিক নেতারা এমনটি করত। তারা বলত জাতির স্বার্থেই তারা এমনটি করছে। তাদের এ কাজকে "নাসী" নামে অভিহিত করা হত। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37)

পটভূমিঃ প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ও হারাম চারটি মাস হলঃ যু-ল-ক্বাইদাহ, যু-ল-হিজ্জাহ, মুহাররাম ও রাজাব। মুশরিকরা মাঝে মাঝে এ নিয়ম বদলে দিত। কোনো বছর তারা মুহাররামকে সাধারণ মাস ঘোষণা করে এর বদলে সফরকে হারাম হিসেবে মর্যাদা দিত এবং বলতঃ এসব করা হচ্ছে জাতীয় স্বার্থে। তাদের এমন পরিবর্তনকে "নাসী" বলা হত। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

নাসী (সময়ের এমন পরিবর্তন) অবশ্যই বর্ধিত কুফর। কাফিররা এভাবেই (আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করে) বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তারা একই মাসকে এক বছর হালাল আর অন্য বছর হারাম বানিয়ে সখ্যাপূর্ণ করে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত হারামকে হালাল বানায় (এবং জাতীয় স্বার্থে এমন করেছে মনে করে গর্ববোধ করে। কারণ) তাদের এসব মন্দকাজকে শোভিত করে দেয়া হয়। আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে) (৯ তাওবাহঃ ৩৭)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কোনো স্থান, স্থাপনা বা সময়কে অন্য স্থান, স্থাপনা বা সময়ের উপর প্রাধান্য দেয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ তায়া'লা। এসবই আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের অংশ। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে কোনো স্থান, স্থাপনা, দিন, মাস বা সময়কে মহান ও পবিত্র ঘোষণা করা মানুষের এখতিয়ারাধীন নয়। এমন করলে আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং শিরক হয়। কিন্তু আজকাল না জেনে, না বুঝে এমন কাজ করে কুফর ও শিরকের দিকে ধাবিত হচ্ছে কত মানুষ।

নমুনাঃ ৩. পশুর উপর পশুর শ্রেষ্টত্বঃ সকল কর্তৃত্বের মালিক আল্লাহ। তাই একমাত্র আল্লাহই পারেন কোনো পশুকে অন্য পশুর উপর শ্রেষ্টত্ব দিতে, এমন কর্তৃত্ব অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু তখনার দিনে মুশরিক ধর্মীয় পন্ডিতরা এমনটি করত। তারা কোনো পশুকে বিশেষ নাম দিয়ে খোদার সেবকদের জন্য হালাল আর অন্যদের জন্য হারাম ঘোষনা করত, এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103)

বাহী'রাহ, সা-ইবাহ, ওয়াস্বীলাহ, হা'ম, এসব আল্লাহ নির্ধারণ করেননি। (কোনোকিছুকে অন্যকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ। এটা হল আল্লাহর কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য। অন্য কেউ এমন করলে আল্লাহর কর্তৃত্বে শিরক হয়। এমন করা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল। এমন করে) কাফিররা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে। আর (যারা এমন করে) এদের অধিকাংশই নির্বোধ। (৫ মা-ইদাহঃ ১০৩)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছেন। নবী চলে যাবার পর লোকজন নবীর আদর্শের সাথে নিজেদের মতাদর্শ মিশ্রিত করে বিভ্রান্ত হয়েছে। তথাপিও ভেবেছে তারাই সঠিক, তারাই নবীর উত্তরসূরি। যেমন হচ্ছে আজকাল। রাসূল সাঃর সময়ে যেসব ইবাদাত, আক্বীদাহ বা পরিভাষার অস্তিত্বই ছিল না এমন অনেক কিছু বানিয়ে আজকাল বলা হচ্ছে এটাই সাহীহ আক্বীদাহ আর এটাই সঠিক। এমন করেছিল আগেকার মুশরিকরা। তাদের বানানো কিছু প্রথা হচ্ছে..

বাহীরাহঃ যে উটনীর প্রথম ৫টি বাচ্ছা মাদী হত ওই উটনীকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে খোদার নামে উৎসর্গ করা হত। এর দুধ দোহন করা সাধারণ মানুষের জন্য হারাম মনে করা হত এবং ওই উটনীর কান কেটে ছেড়ে দেয়া হত। এর নাম দেওয়া হত বাহী'রাহ।

সা-ইবাহঃ খোদার নামে মান্নতকৃত উটকে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে ছেড়ে দেয়া হত। এটাকে বলা হত সা-ইবাহ।

ওয়াস্বীলাহঃ কোনো পশুকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে খোদার নামে ছেড়ে দেয়া হত। আর এটাকে বলা হত ওয়াস্বীলাহ।

হা'মঃ পুরুষ উট নির্ধারিত সংখ্যক উটনীর সাথে সঙ্গম সম্পন্ন করার পর এটাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত এবং বিশেষ চিহ্ন দিয়ে মুক্ত ভাবে ছেড়ে দেওয়া হত। এটাকে বলা হত হা'ম।

উল্লেখিত পশুগুলোকে ধর্মীয়ভাবে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হত। এসব পশুকে কোনো কাজে ব্যবহার করা হত না, এদের দুধ দোহন করা হত না। এসবই ছিল মানুষের মনগড়া অপ-সংস্কৃতি ও কু-সংস্কার। তবে এগুলোকে খোদার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে বলে প্রচার করা হত। এগুলোর সাথে খোদার নাম যুক্ত করা হত এবং খোদার সাথে সম্পৃক্ত করা হত। এসবই ছিল তাদের মিথ্যাচার ও মনগড়া।

পর্যালোচনাঃ এভাবেই যোগে যোগে অনেক রাজনৈতিক নেতা, সমাজপতি ও ধর্মীয় গুরুরা আল্লাহর নীতির নাইরে গিয়ে কোনো ব্যক্তি, সময়, পশু বা বস্তুকে মহান ও মহিয়ান হিসেবে ঘোষনা দিয়ে মহান আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করে শিরকের মত মহা পাপে নিজেরাও জড়াচ্ছে এবং আম জনতাকেও শিরকের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

পরিচ্ছেদঃ ১২. রুবুবিয়্যাতে শিরক

রাব্ব অর্থ প্রভু, মালিক, বিধানদাতা, নীতিনির্ধারক, পালনকর্তা, ইত্যাদি। সেমতে যিনি মালিক, যিনি সকলের প্রয়োজন মিটান, বৈধ-অবৈধ নির্নয় করেন তথা জীবন বিধান ঠিক করে দেন, তিনিই রাব্ব। আল্লাহই আমাদের মালিক, একমাত্র রাব্ব, একমাত্র নীতিনির্ধারক ও বিধানদাতা। তিনিই সকল প্রয়োজন মিটান, জীবন বিধান ঠিক করে দেন, নির্ধারন করেন বৈধ ও অবৈধ। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিধানদাতা বা নীতি নির্ধারক হিসেবে মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে তথা প্রভুত্বে শিরক হয়। জাতি ও সমাজের প্রয়োজনে কোনো আইন প্রণয়ন করার একান্ত প্রয়োজন হলে মানুষ এটা করতে পারবে তবে এটা হতে হবে আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে। আল্লাহর

নীতির বাইরে গিয়ে কোনো আইন তৈরি করা অবৈধ এবং এ আইন হবে অবৈধ আইন। মোদ্দাকথা আইন তৈরিতে মানুষ স্বাধীন হলেও সার্বভৌম নয়। রবং আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনেই মানুষকে আইন তৈরি করতে হবে। এটাই রুবুবিয়্যাতের দাবী। আর আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ মেনে চলাই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

রুবুবিয়্যাতের সাথে যেহেতু আইন, বিধান, নীতি নির্ধারন ও শাসনের মত বিষয়াদি জড়িত তাই সবচেয়ে বেশী শিরক রুবুবিয়্যাতেই হয়ে থাকে। আর এ জন্যই রুহ জগতে আল্লাহ আমাদের থেকে যে ওয়াদা নিয়েছেন এটা ছিল রাব্ব সম্পর্কে আর মরনের পর সর্ব-প্রথম আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব এটাও রাব্ব সম্পর্কে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174)

(হে মানুষ! স্মরণ কর! রুহ জগতে) প্রভু যখন প্রতিটি মানুষের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদের বের করে (স্বীকারোক্তি নিলেন এবং) তাদের ব্যাপারে তাদেরকেই সাক্ষী বানালেন, (বললেন) আমি কি তোমাদের রাব্ব নই? তারা বলেছেঃ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী থাকলাম। (আমি তোমাদের থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েছি এবং তোমাদেরকেই সাক্ষী বানিয়েছি। নতুবা) পরকালে তোমরা বলতেঃ এসব ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। অথবা বলতেঃ আমাদের বাপ-দাদা আগ থেকেই মুশরিক ছিল, আমরা তাদের অনুকরণ করেছি মাত্র। ওই ভ্রান্তদের পাপের সাজা আপনি আমাদেরকে দেবেন? আমি আমার আয়াতকে এভাবেই বারবার বর্ণনা করি, যেন তারা ফিরে আসে। (৭ আ'রাফঃ ১৭২-১৭৪)

জ্ঞাতব্যঃ রুহ জগতে আমরা মহান আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি দিয়েছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে তিনিই আমাদের রাব্ব তথা একমাত্র বিধানদাতা। কিন্তু দুনিয়াতে এসে মানুষ এ সাক্ষ্যের কথা ভুলে যায়। মানুষকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আল্লাহ পাঠান নবী ও রাসূল। উল্লেখ্য সৃষ্টির সূচনা থেকে সর্বশেষ গন্তব্য পর্যন্ত আমাদের জীবন প্রবাহকে ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা..

১ম স্তরঃ মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাদের রুহ সৃষ্টি করেছেন। সকল রুহকে একত্রে সৃষ্টি করে যে স্থানে রাখা হয়েছে এর নাম "আ'লম আরওয়াহ" তথা রুহ জগত। রুহ জগত শুধুই রুহদের জগত। রুহ জগতে দেহ বা শরীর নেই। রুহ জগত আসলে অপেক্ষার জগত। রুহ জগত ক্ষণস্থায়ী জগত। রুহরা দুনিয়ায় আসার জন্য অপেক্ষমান আছে। যখন যার পালা আসছে তখন তার জন্য মাতৃগর্ভে একটি দেহ তৈরি করা হয়। মাতৃগর্ভের দেহটি তৈরি হয়ে গেলে আল্লাহর মনোনীত ফিরিস্তা রুহ জগত থেকে একটি রুহ এনে দেহের ভিতর সেট করে দেয়। তখন থেকে শুরু হয় রুহ আর দেহের সমন্বিত পথ চলা।

২য় স্তরঃ আমাদের জীবন প্রবাহের ২য় স্তর হল দুনিয়ার জীবন। দুনিয়ার জীবন রুহ ও দেহের সমন্বিত জীবন। দুনিয়ার জীবনের মূল লক্ষ্য নেকী বা পুণ্য উপার্জন। এখানে যে যা উপার্জন করবে তার অনন্ত জীবন সে অনুযায়ী গড়ে উঠবে। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবন। দুনিয়ার জীবন নির্ধারিত সময়ের জন্য। এখানে সকলের সময়ই নির্ধারিত। এ নির্ধারিত সময়কে বলা হয় হায়াত। তবে আমরা কেউ কারো হায়াত সম্পর্কে অবগত নেই। সকলের হায়াত শুধু আল্লাহরই জানা। হায়াত শেষ হলে আল্লাহর ফিরিস্তা এসে আমাদের দেহ থেকে রুহকে আলাদা করে নিয়ে যায়। একেই আমরা মৃত্যু নামে অভিহিত করে থাকি।

৩য় স্তরঃ আমাদের জীবন প্রবাহের ৩য় স্তর হল বারযাখ জগত। মৃত্যুর পর আমাদের রুহকে ৩টি জায়গাতে রাখা হয়। শহীদ আর নবীগণের রুহকে রাখা হয় জান্নাতে। নেক লোকদের রুহকে রাখা হয় ই'ল্লীনে আর খারাপ লোকদের রুহকে রাখা হয় সিজ্জীনে। এ তিনের সমন্বিত জীবনের নাম বারযাখ জগত। বারযাখ জগত রুহদের জগত। বারযাখ জগতে দেহ থাকে না। বারযাখ জগত অপেক্ষার জগত। বারযাখে সবাই অপেক্ষা করছে কিয়ামতের জন্য।

৪র্থ স্তরঃ আমাদের জীবন প্রবাহের ৪র্থ স্তর হল আখেরাত বা পরকাল। পরকালের জীবন অনন্ত অসীম ও চিরস্থায়ী জীবন। পরকালের জীবন দেহ ও রুহের সমন্বিত জীবন। পরকালের জীবন ফল ভোগের জীবন। সৎ মুঅমিনরা পরকালে অনন্ত জান্নাতের অধিকারী হবে। কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ ও মুনাফিকরা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আর ফাসিক ধরনের মুসলিমরা অনিশ্চয়তার মাঝে পড়বে। আল্লাহ মাফ করে দিলে তারা জান্নাতে যাবে আর মাফ না করলে তারা জাহান্নামী হবে। তবে ফাসিক জাহান্নামে গেলেও চির জাহান্নামী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে।

রুবুবিয়্যাতে শিরকের নমুনাঃ আদিকাল থেকেই মানব সমাজে রুবুবিয়্যাতে শিরকের প্রচলন শুরু হয়। বিশ্বের বড় বড় শাসকরা এবং ধর্মীয় গুরুরা নিজেদেরকে রাব্ব মনে করত। তারা ভাবত তারা যা বলবে এটাই আইন, এটাই বিধান। নিম্নে রুবুবিয়্যাতে শিরকের কিছু বিধান ও নমুনা পেশ করা হল..

নমুনাঃ ১. রাজা নমরুদঃ ইরাকের রাজা নমরুদ নিজেকে রাব্ব মনে করত, সে ভাবত সেও জীবন মরনের মালিক। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)

তাকে (নমরূদকে) দেখনি? আল্লাহ তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন বলে সে রাব্ব নিয়ে ইবরাহীমের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। যখন ইবরাহীম বললঃ আমার রাব্ব জীবন দেন, মৃত্যু দেন। সে (দুই ব্যক্তিকে ডেকে এনে একজনকে হত্যা করল আর এক জনকে ছেড়ে দিল। -কুরতুবী। তারপর) বললঃ (দেখলে তো) আমিও জীবন দিতে পারি, মৃত্যু দিতে পারি। ইবরাহীম বললঃ (আমার রাব্ব) আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদয় করেন, তুমি (পারলে) পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও। কাফির তখন হতবাক হয়ে গেল। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে না চায়) (২ বাক্বারাহঃ ২৫৮)

জ্ঞাতব্যঃ যারা নাস্তিক, যারা কাফির বা মুশরিক, যারা কুরআন বুঝে না, হাদীছ মানে না, তাদের সাথে তর্ক বা আলোচনা করতে হয় লজিক দিয়ে, যুক্তি দেখিয়ে এবং যুক্তির মাধ্যমেই তাদেরকে হতবাক করে দিতে হয়।

নমুনাঃ ২. রাজা ফেরাউনঃ মিশরের রাজা ফেরাউনও নিজেকে মহান রাব্ব মনে করত, সে ভাবত সেই সবকিছুর মালিক, আইন ও বিধান দেওয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ (19) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ (20) فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ (22) فَحَشَرَ فَنَادَىٰ (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ (24)

তোমার কাছে কী পৌঁছায়নি মূসার খবর? যখন পবিত্র তোয়া উপত্যকায় রাব্ব তাকে ডেকে বললেনঃ ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করছে। তাকে বলঃ তুমি কী তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক থেকে মুক্ত) হতে চাও? (যদি চাও তবে) আমি তোমাকে প্রভুর পথ দেখাব। তুমি তখন শুধু তাকেই ভয় করবে। সে তাকে (মূসা ফেরাউনকে) বড় বড় নিদর্শন দেখাল, তথাপিও সে (প্রভুর পথে আসতে) অস্বীকার করল, অবাধ্য হল, তারপর ফিরে গিয়ে পদক্ষেপ নিল, লোক জমা করে ঘোষণা দিল, বললঃ আমিই তোমাদের মহান রাব্ব। (৭৯ নাযিয়াতঃ ১৫-২৪)

নমুনাঃ ৩. উলামা, পীর ও নবীঃ বানী-ইসরাঈল তথা ইয়াহুদ ও নাসারা তাদের উলামা, পীর ও নবীদেরকে নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে বিধানদাতার আসনে বসিয়ে ছিল, যা আসলে রাব্ব হিসেবে মেনে নেওয়ারই নামান্তর। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)

তারা (ইয়াহুদ নাসারা) আল্লাহ ছাড়াও তাদের আহবার ও রুহবানকে (উলামা ও পীরকে) রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে আর মাসীহ বিন মারইয়ামকেও (তথা নবীকেও) অথচ তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল এক আল্লাহর ইবাদাত করতে। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (উল্লেখ্য ইয়াহুদ উলামাকে আহবার এবং খৃষ্টান পীর ও আবিদদেরকে রুহবান বলা হয়)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে হুযাইফাহ রা.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ ইয়াহুদ খৃষ্টান কি তাদের উলামা ও পীরদের পূজা করত? তিনি বলেছেনঃ না, (পূজা করত না। তবে) তারা (উলামা ও পীরগণ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত) হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বলে ফতোয়া দিলে এটা মেনে নিত। আ'দি বিন হা'তীম বলেনঃ একদা আমি রাসূল সা.র কাছে এলাম। আমার গলায় স্বর্ণের ক্রস ছিল। তিনি বললেনঃ আ'দি! এটা কি? এ বেদিকে ফেলে দাও। তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেনঃ শোন! লোকজন তাদের পূজা করত না। বরং তারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করে ফতোয়া দিলে এটা মেনে নিত। (তাফসীর কুরতুবী)

আলীম, উলামা ও ইমাম মানাঃ আমরা অবশ্যই আলীম উলামা ও ইমামগণকে মান্য করব। তবে মনে রাখতে হবে উনাদের মান্য করারও একটা সীমারেখা রয়েছে। আলীম-উলামা, পীর-মাশায়েখ আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষক। আমরা উনাদেরকে শিক্ষক হিসেবে সম্মান করব, মর্যাদা দেব অবশ্যই। তবে উনারা আমাদের রাব্ব বা বিধানদাতা নন এবং নবীও নন। তাই আল্লাহর কিতাব বা রাসূল সাঃর সুন্নতের বিপরীতে অন্য কারো কথা মেনে নেওয়া যাবে না। আর এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা, মাযহাবী ইমামগণের শিক্ষাও এটাই। ইমাম আবু-হানীফাহ, মালিক, শাফিয়ী' ও আহমাদ সবাই বলে গেছেন "আমার কথার বিপরীতে সাহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে আমার কথা বাদ দিয়ে হাদীছকে আকড়ে ধরবে এবং এটাই আমার শেষ কথা"।

পর্যালোচনাঃ নবীকে নবী হিসেবেই মানতে হবে, রাব্ব বা ইলাহ হিসেবে নয়। কোনো নবীকে রাব্ব বা ইলাহের আসনে বসালে শিরক হয়। আলীম-উলামাকে আলীম-উয়ালাম হিসেবে আর ইমামকে ইমাম হিসেবেই মানতে হবে, রাব্ব ইলাহ বা নবী হিসেবে নয়। কোনো আলীম বা ইমামকে নবীর আসনে বসালে কুফর হয় আর রাব্ব বা ইলাহের আসনে বসালে শিরক হয়।

পরিচ্ছেদঃ ১৩. বৈশিষ্ট্যে শিরক

মহান আল্লাহ তদীয় যাত, উলুহিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত, হাকিমিয়্যাত, তথা জাতিসত্বায়, প্রভুত্বে, কর্তৃত্বে ও সার্বভৌমত্বে যেমন এক ও অদ্বিতীয় ঠিক তেমনিভাবে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যেও। কোনো বৈশিষ্ট্যেই অন্য কেউ বা অন্যকিছু আল্লাহ সমান বা সমকক্ষ নেই। যেমন..

আ'লীমঃ আ'লীম অর্থ জ্ঞানী, যিনি জানেন এবং অবগত আছেন তাকে আ'লীম বলা হয়। আল্লাহ হলেন আ'লীম। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, তিনি সবকিছু জানেন, সকল বিষয়েই অবগত। আমরাও আলিম হই, আমরাও অনেক কিছু

জানি। তবে আমাদের জানা আর আল্লাহর জানা সমান নয়। আল্লাহর জানার সাথে আমাদের জানার কোনো তুলনাই হয় না, হতে পারে না। আমাদের জানা ও আল্লাহর জানার মাঝে তুলনাহীন পার্থক্য রয়েছে। যেমন..

- আমরা যখন শিশু অবস্থায় জন্ম গ্রহন করেছিলাম তখন কিছুই জানতাম না, পরে আস্তে আস্তে জেনেছি। ক্রমে ক্রমে আমাদের জ্ঞান সম্বৃদ্ধ হয়েছে। আল্লাহর জ্ঞান বা জানা কিন্তু এমন নয়। আল্লাহর জ্ঞান আল্লাহর সত্বারই অংশ। তিনি সত্বাগতভাবেই সব জানেন, সর্ব-বিষয়ে মহাজ্ঞানী।
- আমাদের জ্ঞান যেহেতু অর্জনকৃত, তাই এটা কখনো বাড়ে আবার কখনো কমে। আল্লাহর জ্ঞান কিন্তু এমন নয়।
- আমরা একমসয় মেমরী লস করি বা ভুলে যাই। আল্লাহ কিন্তু এমন নয়। ইত্যাদি আমাদের জানা আর আল্লাহর জানার মাঝে তুলনাহীন পার্থক্য রয়েছে।

সামীয়'-ঃ সামীয়' মহান আল্লাহর একটি বৈশিষ্ট্য বা গুণবাচক নাম, সামীয়' অর্থ শ্রুতা, মহান আল্লাহ হলেন সর্বশ্রুতা। তিনি সব শুনেন। যদিও আমরাও শুনতে পারি। তবে আমাদের শ্রবন আর আল্লাহর শ্রবন সমান নয়, সমান হতে পারে না। আমাদের শ্রবন আর আল্লাহর শ্রবনের মাঝে অতুলনীয় পার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ আমাদেরকে শুনতে হলে কানের প্রয়োজন হয়, শ্রবনশক্তির প্রয়োজন হয়, শব্দ তরঙ্গের প্রয়োজন হয়, আর এ সবকিছু আল্লাহরই দান। কিন্তু আল্লাহর শ্রবনের জন্য কোনোকিছুরই প্রয়োজন হয় না।

নমুনা স্বরূপ মাত্র দুটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করা হল। আসলে সকল বৈশিষ্টেই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কোনো বৈশিষ্টেই আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক নেই। এটাই তাওহীদ আর এর বিপরীতে যা আছে সবই শিরক।

বৈশিষ্ট্যে শিরকের নমুনাঃ মানুষ নানাভাবে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে অন্যকে বিশেষিত করে শিরক করে ফেলে। যেমন.. অনেক মানুষ মনে করে মুহাম্মাদ সা. হাজির ও নাযির, মানে সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা। আসলে এ দুটি বৈশিষ্ট্য শুধুই আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সর্বত্র বিরাজমান বা সর্বদ্রষ্টা হতে পারেন না।

আবার অনেকে মনে করেনঃ আল্লাহর ওলীরা মরে না, উনারা অন্তরালে চলে যান, তাই উনারা হচ্ছেন "হাজত রওয়া" মানে ওখানে থেকেও মানুষের হাজর পুরা করতে পারেন। আসলে অমর হওয়া একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। আর মরার পর কারো কোনো ক্ষমতা বা সক্ষমতা থাকে না। ইত্যাদি। এভাবেই নবী রাসূল ও পীর আউলিয়াদেরকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করে শিরকের পথে ধাবিত হচ্ছে আজকালকার কত মানুষ।

পরিচ্ছেদঃ ১৪. কুফর ও শিরক কার্যত একই ধরণের পাপ, উভয় পাপই ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ

কুফর ও শিরক আসলে প্রবাহমান দুটি নদীর মত, যা চলতে চলতে কখনো একইভুত হয়েযায়। অর্থাৎ কখনো কখনো কুফর ও শিরক এক হয়ে একই ব্যক্তির মাঝে মিশে যায়। তাই তো আল-কুরআনে মাঝে মাঝে কুফর ও শিরককে একিভুত করে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8)

কোনো বিপদ-আপদ যখন মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে প্রভুর দিকে ধাবিত হয় এবং প্রভুকে ডাকে। আর প্রভু যখন অনুগ্রহ করেন (বিপদ মুক্ত করে দেন) তখন সে (আগের অবস্থায় ফিরে যায়) যে কারণে প্রভুকে ডেকেছিল এসব ভুলে যায় এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহর সমকক্ষ বানায় (আল্লাহর সাথে শিরক করে। যে ব্যক্তি এমন করে তাকে) বলে দাওঃ তুমি তোমার কুফর নিয়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনে সামান্য উপভোগ করে নাও, নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের একজন। (৩৯ যুমারঃ ৮) এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলঃ শিরককেই কুফর বলা হয়েছে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে..

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)

আল্লাহ কোনো মানুষকে কিতাব, "হুকম" ও নবুয়ত দেওয়ার পর সে বলবে "আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাসত্ব/ইবাদাত কর"! এমন হতেই পারে না। বরং (সে বলবে) প্রভু ভক্ত হও, (প্রভুর) কিতাব শিক্ষা কর এবং অধ্যয়ন কর। নবী কখনো কোনো ফিরিস্তা বা নবীকে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য বলতে পারে না। তোমরা মুসলিম হবার পর নবী কি করে কুফর করার কথা বলবে? (আ-ল ই'মরানঃ ৭৯-৮০)

এখানে লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হলঃ প্রথমে বলা হয়েছে "নবী কখনো কোনো ফিরিস্তা বা নবীকে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়ার কথা বলতে পারে না"। কারণ এটা সুস্পষ্ট শিরক। তারপর বলা হয়েছে "তোমরা মুসলিম হবার পর নবী কি করে কুফর করার কথা বলবে"? উপরে উল্লেখিত শিরককেই পরে কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে..

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا

عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74)

যারা "মাসীহ বিন মারইয়ামকে খোদা বলেছে" তারা কুফর করেছে। অথচ মাসীহ নিজে বলেছে "হে বানী-ইসরাঈল! এক আল্লাহর ইবাদাত কর যিনি আমার ও তোমাদের সকলের রাব্ব"। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে **শিরক** করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তার ঠিকানা জাহান্নাম। জালিমদের সাহায্য করার কেউ নেই। যারা বলে "আল্লাহ তিনের এক" (অর্থাৎ যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে) তারা **কুফর** করেছে। আসলে **ইলাহ** একজনই। তারা যদি এসব কথা থেকে বিরত না হয় (তবে তারা কাফিরই থেকে যাবে। আর) কাফিরদের গ্রাস করবে কঠিন আযাব। তারা কি আল্লাহর কাছে **তাওবাহ ও ইস্তিগফার** করবে না? (করলে আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন।) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৫ মা-ইদাহঃ ৭২-৭৪) এখানে লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল শিরককেই কুফর বলা হয়েছে।

সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ১৫১তম আয়াতে বলা হয়েছে..

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151)

আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেব। কারণ তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, অথচ আল্লাহ্ এ ব্যাপারে (শিরককে বৈধতা দিয়ে) কোনো প্রমান নাযিল করেননি। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। পাপিষ্ঠদের আবাস খুবই জঘন্য।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলঃ "আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেবেন। কারণ তারা শিরক করেছে"। এছাড়াও কাহাফঃ ১০২, আহযাবঃ ২৫, ফুসসিলাতঃ ২৬, ফাতহঃ ২৫,সহ আরো অনেক আয়াতে মুশরিকদেরকে কাফির বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় কুফর ও শিরক দুটি স্বতন্ত্র পাপ হলেও কখনো কখনো একীভূত হয়ে যায়। যদিও কুফর তুলনামূলকভাবে শিরক থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানে সকল মুশরিকই কাফির হয় তবে সকল কাফির মুশরিক হয় না। যেমন এক ব্যক্তি বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে চলে তবে "হুদূদ" মানে না। তার এ পাপকে কুফর বলা যাবে তবে শিরক নয়।

পরিচ্ছেদঃ ১৫. দুনিয়ার জীবনে কাফির মুশরিকদের সাজা ও সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

দুনিয়ার জীবনে কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর কিছু নির্ধারিত নীতি রয়েছে। এসব নীতি মেনেই তাদের সাজা ও জীবন যাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহিত ও বাস্তবায়িত হয়। তা না হলে পাপের পরিনতি হিসেবে জীবনের সূচনাতেই তারা ধ্বংস হয়ে যেত। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19)

সকল মানুষ একই জাতিভুক্ত (মুসলিম) ছিল, পরে দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। (আল্লাহ পাপের সাজা দিতে তাড়াহুড়া করেন না) প্রভু থেকে এমন বাণী নির্ধারিত না থাকলে বিভক্তির পরিণতি হিসেবে তাদের (সাজার) ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত। (১০ ইউনুসঃ ১৯)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ দ্বীন নিয়ে বিভক্তি ও দলাদলি করা কুফর এবং এর সাজা বড় ভয়াবহ। যে বা যারা দ্বীন নিয়ে বিভক্তি বা বিভাজন সৃষ্টি করে উম্মতকে বিভক্ত করে দেয় রাসূল সা.র সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। (দেখুনঃ ৬ আনয়া'মঃ ১৫৯) মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরির জন্য বানানো মসজিদে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। (দেখুনঃ তাওবাহঃ ১০৮)

আশা করি বুঝতেই পারছেন কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি হচ্ছে তাড়াহুড়া না করা। কারন মহান আল্লাহর কাছে সকল কিছুর জন্যই সময় নির্ধারিত। যখন যার সময় আসবে তখন তাই হবে এবং তাই ঘটবে। কোনো কিছুই সময়ের আগে ঘটবে না আর একটু দেরীও হবে না। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34)

আর (মনে রাখবে) প্রতিটি জাতির (উত্থান পতনের) সময় নির্ধারিত। যখন যার সময় আসবে তখনই (উত্থান বা পতন) হবে, একটু আগেও হবে না, একটু পরেও না। (তাই কথাটি সদা মনে রাখবে এবং সবর করবে) (আ'রাফঃ ৩৪)

কাফির মুশরিকদের সাজা ও জীবন যাপনের ব্যাপারে কিছু নির্ধারিত নীতিমালার কথা মহান আল্লাহ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এর কয়েকটিমাত্র বর্ননা করা হল..

নীতিঃ ১. হালকা সাজা দেওয়াঃ মানুষ যখন কুফর বা শিরক করে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যায় আল্লাহ তখন তাদেরকে হালকা আযাব দিয়ে সাবধান করে দেন, যেন তারা আল্লাহর কাছে ফিরে আসে আর নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95)

আমি যে জনপদেই নবী পাঠিয়েছি (তারা অবাধ্য হলে প্রথমে) দুঃখকষ্টের (হালকা) আযাব দিয়েছি, যেন তারা (সৎপথে ফিরে আসে এবং ক্ষমা চেয়ে) মিনতি করে, অতঃপর (ফিরে না এলে) তাদের দুঃখকষ্টকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বদলে দিয়েছি। এতে বিভোর হয়ে তারা বলেছে (এগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ) আমাদের বাপ-দাদার সময়েও এমন দুঃখকষ্ট এসেছে (তারা যখন আযাবকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মনে করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে) তখন হঠাৎ পাকড়াও করেছি এবং কিছু বুঝে উঠার আগেই (ধ্বংস করে দিয়েছি।) (৭ আ'রাফঃ ৯৪-৯৫)

নীতিঃ ২. জীবন উপকরণ বাড়িয়ে দেওয়াঃ হালকা সাজা দেওয়ার পরও মানুষ যখন ফিরে না আসে এবং কুফর শিরকে অবিচল থেকে যায় আল্লাহ তখন তাদেরকে বেশী বেশী দুনিয়ার উপকরন দান করেন। নাযিল হয়েছে..

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45)

তোমার আগে অনেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এবং (রাসূলকে অমান্য করার কারনে) দুঃখকষ্ট ও বিপর্যয় (হালকা আযাব) দিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করেছি, যেন তারা মিনতি করে কিন্তু আমার আযাব আসা সত্বেও তারা মিনতি করেনি। বরং তাদের মন আরো কঠিন হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কাজকে শোভিত করে দিয়েছে (তখন আল্লাহর আযাবকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মনে করে) তারা যখন আগত উপদেশ ভুলে (পাপ-পথে অবিচল) থাকে আমি তখন (বিলাসিতার) দোয়ার খুলে দেই। আর তারা যখন বিলাসিতায় মেতে উঠে তখন (বড় আযাব দিয়ে) হঠাৎ পাকড়াও করি, তারা দিশাহারা হয়ে যায়। পাপিষ্ঠদের শিকড় এভাবেই কেটে ফেলা হয়। সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহর যিনি সর্বজগতের রাব্ব। (৬ আনয়া'মঃ ৪২-৪৫)

নীতিঃ ৩. ধন সম্পদ ও বিলাসি জীবন দানঃ মানুষ যখন কুফর শিরকে ডুবে থাকে আল্লাহ তখন তাদের ধ্বংসের ফয়সালা করে ফেলেন এবং তাদেরকে ধন, সম্পদ, নেতৃত্ব, বিলাস সামগ্রী অধিক পরিমানে দান করেন যেন তারা এতে বুধ হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا ۚ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35)

যদি সকল মানুষ একই জাতিভূক্ত (তথা কাফির) হয়ে যাবার আশংকা না হত তবে যারা রাহমানের সাথে কুফর করে আমি (তাদের এতো সম্পদ দিতাম যে) তাদের ঘরের ছাদ, আরোহণের সিঁড়ি, ঘরের দরজা এবং হেলান দেয়ার সোফা রূপা ও সোনার (তৈরি) হত। কারণ এসব হল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপকরণ (আল্লাহর কাছে এসব মূল্যহীন।) মুত্তাক্বীদের জন্য তোমার প্রভুর কাছে রয়েছে আখেরাত (জান্নাত।) (৪৩ যুখরুফঃ ৩৩-৩৫)

পর্যালোচনাঃ ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা কখনো আল্লাহর ভালোবাসার আলামত নয়, এগুলো কাফির-মুশরিকদেরকেও দেওয়া হয়। বরং হেদায়াত, সবর, তাকওয়া, ইহসান, ইত্যাদি, উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসার আলামত। তাই "আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন, আর এজন্যই আমাকে ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা দিয়েছেন" এমন কথা বলা যাবে না। বরং বলতে হবে "আল্লাহর আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে; আমাকে ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা দান করেছেন" আর বলা যাবে; "আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন আর এজন্যই আমাকে হেদায়াত, সবর, তাকওয়া, ইহসান, দান করেছেন"।

নীতিঃ ৪. অবকাশ দেওয়াঃ সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে আল্লাহ কাফির মুশরিককে অবকাশ দেন। এ যেন ফাসির আসামীকে সর্বশেষ খাবার হিসেবে ভালো খাবার দেওয়াত মত অবস্থা। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17)

অথচ তারা (এ কুরআনের বিরুদ্ধে) গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আমিও কৌশল চূড়ান্ত করে ফেলেছি। কাফিরদের অবকাশ দাও, একটু অবকাশ দাও। (৮৬ ত্বারিক্বঃ ১৫-১৭)

তবে এ অবকাশ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178)

যারা কুফর করে তারা যেন না ভাবেঃ আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি এটা তাদের জন্য কল্যাণকর। আমরা তাদেরকে অবকাশ দেই যেন তারা আরো বেশী পাপ করে। কারণ তাদের তরে অবধারিত আছে লাঞ্ছনার আযাব। (আল-ই'মরানঃ ১৭৮)

অধ্যায়ঃ ৪. নিফাক্ব বা মুনাফিকী

প্রারম্ভিক কথাঃ নিফাক্ব বা মুনাফিকী কুফর-শিরকের মতই ঈমান বিনষ্টকারী। নিফাক্ব বা মুনাফিক্বী আসলে কুফর-শিরকেরই ভিন্ন নাম। কোনো মুসলিম যদি কুফর বা শিরক করে তবে এরই নাম হয় নিফাক বা মুনাফিকী আর ওই ব্যক্তি হয় মুনাফিক। মুনাফিক বাহ্যত মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। তাই তো দেখা যায়..

- ✓ মুনাফিকরা নামায পড়ে, রোজা রাখে, হজ্ব করে, যাকাত দেয়। অন্য কথায় কিছু ইবাদাত বন্দেগী করে কিন্তু সমস্যা থাকে তার নীতি-আদর্শে, তার বিশ্বাসে, ত্বাগূতের সাথে সম্পর্কে এবং কাফিরদের সাথে মিত্রতায়।
- ✓ মুনাফিক ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মানে কিন্তু পরিপূর্ন জীবন আদর্শ হিসেবে মানে না।
- ✓ মুনাফিক ধার্মিক সাজতে পছন্দ করে কিন্তু আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে না।
- ✓ মুনাফিক (নামায রোজা হজ্ব যাকাতসহ) জীবনের কিছু ব্যাপারে ইসলামী বিধান মেনে চলে। আর (সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যবসা, শিক্ষা, সংস্কার, সংস্কৃতিসহ) কিছু ব্যাপারে মেনে চলে অন্য বিধান।
- ✓ মুনাফিক তার বাস্তব জীবনে ইসলাম ও কুফরকে একত্রে মিশিয়ে ফেলে।

- ✓ মুনাফিক তার বাস্তব জীবনে ইসলাম ও কুফরের সমন্বয়ে এক নতুন পথ তৈরি করে।
- ✓ মুনাফিক আদর্শগতভাবে একই সাথে ইসলাম ও কুফর গ্রহণ করে।
- ✓ মুনাফিক দুনিয়ায় মুসলিম হিসেবে পরিচিতি পেলেও আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত তালিকায় কাফিরই থেকে যায়।
- ✓ মুনাফিক আখেরাতে কাফির ও মুশরিকদের সাথে চির জাহান্নামী হবে।

কুফর ও শিরক যেভাবে ঈমানকে একেবারে বিনষ্ট করে দেয়, নিফাক্ব বা মুনাফিক্বীও একইভাবে ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা একান্তই আবশ্যক। বুঝার সুবিধার্থে এ অধ্যায়কে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যথা..

১ম অনুচ্ছেদঃ নিফাক্ব ও মুনাফিকী পরিচিতি
২য় অনুচ্ছেদঃ মুনাফিক্বের স্বভাব
৩য় অনুচ্ছেদঃ মুনাফিকের পরিনতি
৪র্থ অনুচ্ছেদঃ দুনিয়ার জীবনে মুনাফিক ব্যক্তিকে ধন সম্পদ ও নেতৃত্ব দেওয়ার কারন

১ম অনুচ্ছেদঃ নিফাক্ব ও মুনাফিক্বী পরিচিতি

নিফাক্বের আরবী মূল শব্দ "নাফক্ব" ও "নাফাক্বাহ"। নাফক্ব অর্থ সুড়ঙ্গ। আর নাফাক্বাহ অর্থ বাহির ও ভিতরের ভিন্নতা। সে মতে কপটতা করা, দ্বিমুখী হওয়া, বহুরূপী হওয়া, ইত্যাদি কাজকে বলা হয় "নিফাক্ব" বা মুনাফিক্বী।

সামাজিক পরিভাষায়ঃ ভিতরের মন্দকে গোপন করে বাইরে ভালো সাজার নাম "মুনাফিকী"। আর যে ব্যক্তির মাঝে এমন স্বভাব পাওয়া যায় তাকে বলা হয় "মুনাফিক"।

আর ইসলামী পরিভাষায়..

- ➢ যে মুসলিম পরিপূর্নভাবে ত্বাগূত বর্জন করেনি
- ➢ অথবা আল্লাহ থেকে আগত কোনো তথ্যের উপর (আংশিক বা পূর্নাঙ্গ) বিশ্বাসে অবিচল নয়
- ➢ অথবা কাফিরদের সাথে মিত্রতা রাখে
- ➢ অথবা ইসলাম গ্রহন করা সত্ত্বেও কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়েছে, তাকে মুনাফিক বলা হয় (যদিও সে নামায রোজা দাড়ি জুব্বা হিজাব নিকাবসহ অনেক আমলে পাকা হয়)

মোদ্দা কথাঃ যে মুসলিম কুফর বা শিরকের সাথে জড়িয়ে পড়ে অথবা ঈমান বিনষ্টকারী কোনো পাপে যুক্ত হয়ে নিজের ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে সে-ই মুনাফিক। যদিও সে বাস্তব জীবনে নামায, রোজা, হাজ্জ, যাকাতসহ অনেক নেক কাজ করে থাকে। অন্য কথায় ঈমান শূন্য মুসলিমকে মুনাফিক বলা হয় (যদিও সে আমলদার হয়)

মুনাফিক মানুষের চুখে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতমতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত থেকে চিরিতরে বঞ্চিত হয়ে যায়। পরকালে মুনাফিককে মাফ করা হবে না, মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না, এমনকি মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ।

মুনাফিক যেহেতু ইসলাম ও কুফর একই সাথে গ্রহণ করে, মুনাফিক যেহেতু ইসলাম ও কুফরের সমন্বয়ে মিশ্রিত জীবন যাপন করে, মুনাফিক যেহেতু ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে নতুন পথ তৈরি করে, মুনাফিক যেহেতু আল্লাহ্, রাসূল ও মুঅমিনদের সাথে প্রতারণা করে, তাই মুনাফিকের ব্যাপারে ইসলামী বিধান বড় কঠিন ও কঠোর। মুনাফিকের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে অনেক কিছু বর্নিত হয়েছে। নিম্নে এসবের কয়েকটি পেশ করা হল..

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ১. মুনাফিকরা ফাসাদকারী হয়। মুনাফিকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ইরশাদ হচ্ছে...

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14)

কিছু মানুষ এমন আছে যারা বলেঃ আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছি, (ঈমান আনলে মানুষ মুঅমিন হয় আর মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। কিন্তু ওইসব লোক মুখে ঈমানের কথা বললেও) আসলে এরা মুঅমিন নয় (বরং মুনাফিক।) এরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করছে, মুঅমিনদের সাথেও প্রতারণা করছে। (কিন্তু আসল ব্যাপার হল) এরা নিজেকেই প্রতারিত করছে। তবে (এরা এসব বুঝে

না। কারন) এ অনুভুতিও এদের নাই। আসলে এদের অন্তর (মুনাফিকী রোগে) রোগাক্রান্ত। আর আল্লাহ এদের এ রোগ আরো বাড়িয়ে দেন। এদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব, মিথ্যার পরিণতিতে।

যখন বলা হয় "যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) কর না"। এরা বলে "আমরা সংশোধন করছি"। আসলে এরাই ফাসাদকারী (পাপাচারকারী) কিন্তু (পাপাচার আর সংশোধন বুঝার মত) এতটুকু অনুভুতিও এদের নেই।

যখন বলা হয়ঃ মানুষ (সাহাবাগণ) যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন বলেঃ আমরা ঈমান আনব ওই বেকুবদের মত? আসলে এরাই বেকুব কিন্তু এতটুকু (বুঝার মত) জ্ঞানও এদের নেই।

মুঅমিনদের সাক্ষাতে এরা বলে "আমরাও মুঅমিন"। আর শয়তানদের (ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদের) সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে "আমরা তোমাদেরই সঙ্গী" (ঈমানের কথা বলে) তাদের সাথে উপহাস করছি মাত্র। (২ আল-বাক্বারাহঃ ৮-১৪)

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ২. মুনাফিকরা প্রতারক হয়। তারা বাহ্যত মুসলিম সাজে কিন্তু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে না। তারা গতানুগতিক ইবাদাত করে কিন্তু আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলে না। ইরশাদ হচ্ছে..

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3)

(হে নবী!) মুনাফিকরা তোমার কাছে এসে বলবেঃ "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল"। আল্লাহও জানেন যে; তুমি তাঁর রাসূল। তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন; মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যুক। তারা তাদের শপথ (ও সাক্ষ্য)কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাদের কাজকর্ম বড়ই জঘন্য। কারণ তারা ঈমান আনে, আবার কুফর করে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর এটে দেওয়া হয়। তাই তারা (দ্বীনি বিষয়াদি ও নীতি আদর্শ) বুঝতে পারে না। (৬৩ আল-মুনাফিকূনঃ ১-৩)

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ৩. মুনাফিকরা সবার কাছ থেকে ফায়দা লুটতে চায়, ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা কাফিরদের সহায়তা করে। মুসলিম হয়েও তারা ইসলামের বিজয় পছন্দ করে না। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)

(তোমরা যুদ্ধে গেলে) তারা অপেক্ষায় থাকে। আল্লাহর সাহায্যে তোমাদের বিজয় হলে তারা বলে "আমরাতো তোমাদেরই সঙ্গী" আর কাফিররা বিজয়ী হলে তাদেরকে বলেঃ "আমরা কি তোমাদের আগলে রাখিনি? মুঅমিনদের থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি"? (অর্থাৎ মুনাফিকরা সবার থেকে ফায়দা লুটে, সকলের উপর নিজেদের অবদান প্রকাশ করে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকলের বিচার করবেন। আল্লাহ কোনো কাফিরকে মুঅমিনদের বিরোধিতা করার বৈধতা দেননি। (৪ নিসাঃ ১৪১)

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ৪. মুনাফিকরা বাহ্যত কিছু দ্বীনি কাজ-কর্ম করলেও আসলে আল্লাহর ইবাদাত করে না। তারা নীতিহীন ও আদর্শহীন হয়। তারা ভাল মুসলিম হতে পারে না, ভাল কাফিরও হতে পারে না। তারা ইসলাম ও কুফরের মাঝে দুদুল্যমান থাকে। ইরশাদ হচ্ছে...

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143)

মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। তাদের এ ধোঁকার প্রতিফল তিনি অবশ্যই দেবেন। তারা নামাযে দাড়ায় অলসভাবে, লোক দেখানোর জন্য, আল্লাহর স্মরণ তারা কমই করে। তারা (ঈমান ও কুফরের) মাঝে ঝুলন্ত। এদিকেও নয়, অদিকেও নয়। আল্লাহ যদি কাউকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য তুমি পথ খুঁজে পাবে না। (৪ নিসাঃ ১৪২-১৪৩)

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ৫. মুনাফিকরা বাহ্যত মুসলিম হলেও আসলে কাফির। এদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

انَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করে এবং বলেঃ কিছু মানি আর কিছু মানি না। যারা ঈমান ও কুফরের মাঝে নতুন পথ বানাতে চায় এরা হল আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে আমি তৈরি রেখেছি (জাহান্নামে) লাঞ্ছনার আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০-১৫১)

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ৬. মুনাফিকরা নিজের ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কুফর আমদানী করে। তারা বিভ্রান্ত, তাদের তবে কঠিন আযাব। ইরশাদ হচ্ছে..

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)

এরা হেদায়াতের বিনিময়ে বিভ্রান্তি কিনেছে। এদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, এরা হেদায়াত পাবে না। (২ বাক্বারাহঃ ১৬)

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177)

যারা কুফরের বিনিময়ে ঈমানকে বিকিয়ে দিল তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৭৭)

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ৭. মুনাফিকরা আসল মুসলিম নয়। কারণ তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, ইসলামকে জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে নেয়নি। তারা মুসলিম হওয়ার ভান করে মাত্র। ইরশাদ হচ্ছে..

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57)

তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর নামে কসম করে বলেঃ তারা তোমাদেরই জাতিভুক্ত (মুসলিম।) আসলে তারা তোমাদের জাতিভুক্ত নয়। বরং তারা (ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে গঠিত) আলাদা জাতি। (মুনাফিকরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পছন্দ না) কোনো আশ্রয়স্থল, গুহা বা ঠাই খুঁজে পেলে তারা সেখানে গিয়ে জমা হবে। (৯ তাওবাহঃ ৫৬-৫৭)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32)

আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, প্রকাশ করব তোমাদের কে (দ্বীনের উপর) অবিচল থেকে (আল্লাহর পথে) জিহাদ করে, প্রকাশ করব তোমাদের আসল অবস্থা। (আর জেনে রেখো!) হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়া সত্বেও যে বা যারা কুফর করবে, (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং রাসূলের বিরোধিতা করবে (তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে।) তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বরং আল্লাহ তাদের সকল আ'মাল নিস্ফল করে দেবেন। (৪৭ মুহাম্মাদঃ ৩১-৩২)

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলিম হয়েও আল্লাহর পথে তথা দ্বীন কায়েমে, দ্বীন পালনে, দ্বীনি শিক্ষা বা দ্বীনের প্রচারে বাঁধার সৃষ্টি করে অথবা এসব কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে বা অন্য কোনোভাবে কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়ে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। পরকালে তারা কিছুই পাবে না। তাদের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ৮. মুনফিকরা আসলে মুঅমিন নয়। তারা শুধু মুখে ঈমান আনে। তারা কুফরের দিকে ধাবমান হয়। তারা ব্যক্তি স্বার্থে বিচার ও শাসনকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে চায়। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41)

হে রাসূল! যারা শুধু মুখে ঈমান আনে, অন্তর দিয়ে ঈমান আনে না (অর্থাৎ যারা মুনাফিক) আর যারা ইয়াহুদ তারা কুফরের দিকে দ্রুত ধাবমান, তাদের এ ধাবিত হওয়া যেন তোমাকে ভাবনায় না ফেলে। (তাদের স্বভাব হল) তারা (সমাজে বিদ্যমান বিভ্রান্তদের) মিথ্যাচার শুনছে এবং যারা এখনো তোমার কাছে আসেনি (ভবিষ্যতে আসবে) তাদের কথাও শুনবে। তারা আল্লাহর বাণীকে তার সঠিক অবস্থান থেকে তাহরীফ করে (বদলে ফেলে। আর তোমার কাছে মামলা পাঠিয়ে) বলেঃ এমন (ফয়সালা) দিলে মেনে নেবে আর এমন দিলে মানবে না (এমনটি করেছিল একদল ইয়াহুদ উলামা। তারা রাসূল সাঃর কাছে যিনার মামলা পাঠিয়ে বলেছিলঃ "রাজম" এর সাজা দিলে মানবে না। আর অন্য সাজা দিলে মেনে নেবে। আসলে অধিক পাপের কারনে আল্লাহ তাদের বিভ্রান্ত করে রেখেছেন। আর) আল্লাহ কাউকে বিভ্রান্ত করতে চাইলে তুমি (নবী) কিছুই করতে পারবে না। (যারা এমন করে) আল্লাহ তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের তরে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। (৫ মা-ইদাহঃ ৪১)

লক্ষণীয় বিষয় সমূহঃ এখানে মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের একত্রিত করা হয়েছে। কারণ তাদের স্বভাব প্রায় একই ধরনের হয়।

- আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহই জ্ঞানের উৎস। প্রয়োজনে ইজতিহাদ করতে হলে কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি মেনেই করতে হবে।
- দ্বীনি ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহর বিপরীতে যা বলা হয় বা করা হয় সব মিথ্যাচার।
- বিভ্রান্তদের মিথ্যাচার মেনে নেওয়া মুনাফিকদের স্বভাব। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর এখন হচ্ছে আমাদের মুনাফিক সমাজ।
- যারা "শারীয়াহর বিধান নিজের বা দলের পছন্দ মত হলে মানে, নতুবা মানে না" তারা বিভ্রান্ত। তখনকার দিনে এমন করে বিভ্রান্ত হয়ে ছিল ইয়াহুদ। আর আজকাল আমাদের অনেক মানুষ। এদের মাঝে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে, স্যাকুলাররা, বিদয়া'তীরা এবং দলবাজরা।
- আল্লাহর কিতাব বা রাসূল সা.র হাদীছের কোনো বাণীকে তার আসল অর্থ বা মর্ম থেকে বিচ্যুত করা বিভ্রান্তির পথ। তখনকার দিনে এমন করত ইয়াহুদ আর এখন করছে সুবিধাবাদী দলবাজরা।

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ৯. মুনাফিকরা রটনাকারী ও পাপিষ্ঠ হয়। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)

যারা আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয়; দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাদের উপর লা'নত করেন। তাদের জন্য তৈরি রয়েছে লাঞ্ছনার আযাব। যারা বিনা দূষে মুঅমিন নর-নারীকে কষ্ট দেয় তারা সুস্পষ্ট পাপ আর অপবাদের বুঝা নিয়ে উঠবে। (৩৩ আহযাবঃ ৫৭, ৫৮)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68)

মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী আর কাফিরদের জন্য আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন জাহান্নামের, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট। তাদের প্রতি লা'নত। তাদের তরে চিরস্থায়ী আযাব। (তাওবাহঃ ৬৮)

লা'নত পরিচিতিঃ আল্লাহর রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত করাকে লা'নত বলা হয়। আল্লাহর লা'নতের ফলে মানুষ দুনিয়াতে হয় হেদায়াত বঞ্চিত আর আখেরাতে জান্নাত বঞ্চিত।

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ১০. মুনাফিকরা কাফিরদের সাথে মিত্রতা করে, তারা ইজ্জত, সম্মান ও নেতৃত্ব হাসিলের জন্য এমনটি করে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে..

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139)

মুনাফিকদের সংবাদ দাও; তাদের তরে অবধারিত যন্ত্রণাদায়ক আযাব, যারা মুঅমিনদের বদলে কাফিরদেরকে ওয়ালী বানায়। তারা কি এদের কাছে ইজ্জত চায়? আসলে সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (নিসাঃ ১৩৮-১৩৯)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র বা অভিভাবক, কাফিরদেরকে ওয়ালী বানানো কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। হয়ে যায় চির জাহান্নামী। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাজা পড়তে এবং তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

মুনাফিক্ব পরিচিতিঃ ১১. মুনাফিকরা কুফর প্রিয় জাতি। তারা কুফরকে ভালোবাসে এবং ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণ করে। এ কারনে আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নামে আযাব দেবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178)

যারা (মুনাফিকরা) দ্রুত কুফরের দিকে ধাবমান হয়; তাদের নিয়ে ভেব না। তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান আখেরাতে তাদের কিছুই না থাকুক। তাদের তরে কঠিন আযাব। যারা ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। এসব কাফিররা যেন না ভাবেঃ আমি তাদের যে অবকাশ দিচ্ছি এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আমরা তাদেরকে অবকাশ দেই যেন তারা পাপ করে। তাদের তরে লাঞ্ছনার আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৭৬-১৭৮)

২য় অনুচ্ছেদঃ মুনাফিকের স্বভাব

মুনাফিক ব্যক্তি একই সাথে ইসলাম ও কুফর গ্রহণ করে। তাই তাদের জীবনটা হয়ে উঠে ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রন। তাদের বাস্তব জীবনে বেশ কিছু ভালো গুন দেখা যায়, সাথে থাকে মন্দ স্বভাবও। তাদের মাঝে মুসলিমের স্বভাবও বিদ্যমান থাকে এবং কাফিরের স্বভাবও।

মুনাফিকের অনেক মন্দ স্বভাব কুরআন ও হাদীছে বর্নিত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে এসব বদ-স্বভাব ঈমান বিনষ্টকারী ও বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাড়ায়। তাই এসব বদ-স্বভাব চিনে রাখা এবং এসব থেকে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই এসব মন্দ স্বভাবের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

স্বভাবঃ ১. মুনাফিকরা মুসলিম সাজে, ঈমান জাহির করে কিন্তু অন্তর দিয়ে ঈমান আনে না। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)

কিছু মানুষ এমন আছে যারা (মুখে) বলেঃ আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছি কিন্তু আসলে এরা মুঅমিন নয়। (২ বাক্বারাহঃ ৮)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)

বেদুইনরা বলে "আমরা ঈমান এনেছি" বলঃ তোমরা ঈমান আননি বরং বল "ইসলাম গ্রহণ করেছি" কারনঃ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর (সঠিকভাবে ঈমান আন। তাহলে) আল্লাহ তোমাদের আ'মাল বরবাদ করবেন না। (নতুবা সব বরবাদ হয়ে যাবে) আল্লাহ গাফূর, রাহীম। (৪৯ হুজরাতঃ ১৪)

স্বভাবঃ ২. মুনাফিকরা নামায পড়ে, রোজা রাখে, হজ্ব করে, উমরাহ করে, যাকাত দেয়, কুরবানী করে। তারা এসব করে লোক দেখানোর জন্য, খ্যাতির জন্য, নাম কামানোর জন্য। ইরশাদ হচ্ছে...

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142)

মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। তাদের এ ধোঁকার প্রতিফল তিনি অবশ্যই দেবেন। তারা নামাযে দাড়ায় অলস ভাবে, লোক দেখানোর জন্য, আল্লাহর যিকর (ইবাদাত হিসেবে এসব কাজ) তারা কমই করে। (৪ নিসাঃ ১৪২)

স্বভাবঃ ৩. মুনাফিকরা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে মানে কিন্তু জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে নেয় না। তাই তারা দ্বীন আর সমাজকে আলাদা করে দেখে। তারা বলে ধর্ম আর রাষ্ট্র আলাদা বিষয়। ইরশাদ হচ্ছে...

أَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27)

যারা আল্লাহর সাথেকৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ যা (দেশ, জাতি, সমাজ ও দ্বীনকে) একিভূত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তারা এসবকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে (এবং বলে ধর্ম আর রাষ্ট্র আলাদা) আর যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করে। (যে বা যারা এমন হয়ে গেলো) তারা চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেলো। (২ বাক্বারাহঃ ২৭)

জ্ঞাতব্যঃ স্যাকুলার মতাদর্শ হচ্ছেঃ ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত এবং ঐচ্ছিক বিষয়, মানুষ চাইলে তার ব্যক্তিজীবনের কিছু বিষয়ে ধর্ম পালন করতে পারবে। তবে দেশ, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্র হবে ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত। আর ইসলামী বিধান মতে "ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ, তাই মানুষের অন্তরের বিশ্বাস, জীবনের নীতি আদর্শ ও নৈতিকতা এবং বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি বিষয়ে মেনে চলতে হবে শুধুই ইসলামী বিধান"।

স্বভাবঃ ৪. মুনাফিকরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মেনে মেনে নেয় না এবং চলে না। তারা জীবনের কিছু ব্যাপারে ইসলাম বিধান মেনে চলে আর কিছু ব্যাপারে অন্য বিধান। ইরশাদ হচ্ছে...

انَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করে এবং বলেঃ কিছু মানব আর কিছু মানতে পারব না এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে নতুন পথ বানাতে চায়; এরাই আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে অবধারিত আছে (জাহান্নামে) লাঞ্ছনার আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০-১৫১)

স্বভাবঃ ৫. মুনাফিকরা কথায় পটু, অতি চালাক ও ধুর্ত স্বভাবের হয়। কখনো কথার মারপ্যাঁচে আর কখনো সরলতার ভান করে তারা অতি সহজে মানুষকে খুশী করতে পারে।

স্বভাবঃ ৬. মুনাফিকরা চরম হিংসুটে হয়। হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষের ফসল নষ্ট করে, জীবজন্তুর ক্ষতি করে।

স্বভাবঃ ৭. মুনাফিকরা দাম্ভিক ও অহংকারী হয়। পাপ করেও তারা দম্ভ করে। আর তাওবাহ ও সংশোধনীর কথা বলা হলে তারা তারা একে অপমান মনে করে। ইরশাদ হচ্ছে...

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)

পটভূমিঃ উবাই বিন শারীক্ব মদীনার এক ধুর্ত লোক। বাহ্যত মুসলিম হলেও নীতি আদর্শের বালাই ছিল না, তার সখ্যতা ছিল কাফিরদের সাথে। সাহাবাদের কাছে সে আখনাস নামে পরিচিত ছিল। আখনাস অর্থ পলায়নকারী। বদর যুদ্ধে বানী-যুহরার ৩০০লোক নিয়ে পালিয়ে ছিল বিধায় তাকে আখনাস বলা হত। আখনাস ছিল খুব মিষ্টভাষী, কথায় পটু। সাহাবাগণ যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলে সে বাহ্যত নিজের অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ করল এবং বললঃ আমার অন্তরের খবর আল্লাহ জানেন, আমি সত্য বলছি। *(রাসূল সা. তাকে তাকওয়ার উপদেশ দিলেন। বাহ্যত তাওবাহ করলেও ভিতরে ভিতরে অপমান বোধ করে মুসলিমদের প্রতি তার হিংসা ও জ্বালা আরো বেড়ে গেল। কিছু করতে না পেরে)* হিংসার জ্বালায় মুসলিমদের কয়েকটি গাধাকে মেরে ফেলল এবং কিছু ফসলী জমি নষ্ট করল। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলঃ (কুরতুবী)

দুনিয়ায় এমন লোকও আছে যে কথা দিয়ে তোমাকে মুগ্ধ করে ফেলবে আর অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষি বানাবে। কিন্তু আসলে সে চরম ঝগড়াটে। সে ফিরে গিয়ে যমীনে ফাসাদ করে, নষ্ট করে ফসল ও নসল (বংশ।) আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না। তাকওয়ার কথা বলা হলে পাপিষ্ঠের ইজ্জতে লাগে। (যে ব্যক্তি এমন হয়ে যায়) তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, নিকৃষ্টতম আবাস। (২ বাকারাহঃ ২০৪-২০৬)

স্বভাবঃ ৮. মুনাফিকরা নীতি ভ্রষ্ট, আদর্শহীন ও স্বার্থপর হয়। তারা নীতি আদর্শের ধারধারে না। পার্থিব স্বার্থটাই তাদের কাছে বড় মনে হয়। ইরশাদ হচ্ছে...

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ(48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ(49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)

তারা (মুসলিমরা) বলে আমরা আল্লাহ রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত। তথাপিও তাদের কিছু মানুষ অন্য পথে ফিরে যায়। আসলে এরা মুঅমিন নয়। (কারন) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর (কুরআনের কোনো আয়াত বা কোনো হাদীছে) ব্যক্তিগত ফায়দা হলে অনুগত হয়ে ছুটে আসে। (এরা কেন এমন করছে?) তবে কি এদের অন্তর রোগাক্রান্ত? না এরা সন্দিহান, নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে এরাই অবিচারী (বিচার ও শাসন থেকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে এরা মহা অবিচার করেছে। কারন যার অন্তরে ঈমান আছে সে এমন করতেই পারে না) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (শারীয়া'হ আইনের) প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅমিনদের কথা হবে একটাই; "শোনলাম আর মেনে নিলাম"। যারা এমন করে (জীবনের লক্ষ্য অর্জনে) কেবল তারাই সফল হয়। (২৪ নূরঃ ৪৭-৫১)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল থাকতে হয় এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান মেনে নিতে হয় ও মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু বিষয়ে ইসলাম আর কিছু বিষয়ে অন্য নীতি বা বিধান মেনে নিলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজের অনেক মানুষ কিছু ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে নিলেও বিচার ও শাসনের বেলায় মেনে চলে অন্য বিধান। উক্ত আয়াতে এদের কথাই বলা হয়েছে। এরা আসলে মুঅমিন নয়, মুনাফিক।

স্বভাবঃ ৯. মুনাফিকরা বাহ্যত মুসলিম হলেও নীতি, আদর্শ, নৈতিকতা, ইত্যাদির তোয়াক্কা করে না। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে স্বার্থ হাসিল করতে চায়। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا(60)

পটভূমিঃ মদীনাতে বিশর নামী এক লোক ছিল। লোকটি মুসলিম ছিল। কিন্তু তার কাছে নীতি নৈতিকতার চেয়ে জাগতিক স্বার্থটাই বড় ছিল। বিশর অন্যায়ভাবে এক ইয়াহুদীর জমি দখল করে নেয়। ইয়াহুদী বিচারের জন্য রাসূল সাঃর কাছে আসতে চাইল। *(রাসূল সা. মদীনার নেতা। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় আলাদা বিচার বিভাগ ছিল না। নেতাগণই বিচার করতেন)* আর বিশর যেতে চাইল ইয়াহুদ নেতা কায়া'ব বিন আশরাফের কাছে। *(কারন তাকে ঘোষ দিয়ে নিজের পক্ষে রায় নেয়া সহজ হবে)* কিন্তু ইয়াহুদ রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত মামলাটি মুহাম্মাদ সা.র আদালতে উঠল। শোনানির পর রাসূল সা. ইয়াহুদের পক্ষে রায় দিলেন।

কিন্তু বিশর এতে সন্তুষ্ট হল না। সে আবুবকর রা.র কাছে গিয়ে পুনর বিচার দাবী করল। তিনিও ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। বিশর এতেও সন্তুষ্ট হল না। সে উমর রা.র কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থী হল। ইয়াহুদী বললঃ আমরা রাসূল ও আবুবকরের কাছে গিয়ে ছিলাম। তারা আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। উমর রাঃ বিশরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ লোকটি কি ঠিক বলছে? বিশর বললঃ জি। উমর বললেনঃ অপেক্ষা কর। তিনি তলোয়ার এনে বিশরের জীবন লিলা সাঙ্গ করে দিলেন এবং ঘোষণা করলেনঃ যে ব্যক্তি রাসূলের বিচারে খুশী নয় এটাই তার উপযুক্ত বিচার। *(কুরতুবী, হাদীছটি দ্বাইফ। দ্বাইফ হাদীছ আক্বীদাহ বা বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হয় না। তবে ইতিহাস বা ঘটনা বর্ননায় তেমন সমস্যা নাই)* নাযিল হলঃ

তাদের দেখনি? যারা মনে করেঃ তারা তোমার প্রতি এবং ইতোপূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে। আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগূতের কাছে? অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে। শয়তান তাদেরকে পরিপূর্নভাবে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। (নিসাঃ ৬০)

ত্বাগূত পরিচিতিঃ ত্বাগূত এর মূল শব্দ ত্বুগ'ইয়ান অর্থ অবাধ্যতা। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও অশুভ শক্তিকে ত্বাগূত বলা হয়। সবচেয়ে বড় ত্বাগূত শয়তান। বিভ্রান্তির মাধ্যম হিসেবে মূর্তিকেও ত্বাগূত বলা হয়ে থাকে।

স্বভাবঃ ১০. মুনাফিকরা কুফর শিরক ও ইসলাম একসাথে গ্রহণ করে। তাই তাদের জীবনটা হয়ে উঠে ইসলাম ও কুফর শিরকের সংমিশ্রন। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ(106)

অনেকেই আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও মুশরিক হয়ে যায় /মুশরিক থেকে যায়। (১২ ইউসুফঃ ১০৬)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ অনেক মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও আল্লাহর জাতি সত্বায়, উলুহিয়্যাতে, রুবুবিয়্যাতে তথা আল্লাহর কর্তৃত্বে প্রভুত্বে বা সার্বভৌমত্বে অথবা আল্লাহর কোনো বৈশিষ্টে শিরক করে। যারা এমন করে তারা মুশরিক হয়ে যায় বা মুশরিক থেকে যায়।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)

যে ব্যক্তি ঈমানের পর কুফর করল (সে কাফির হয়ে গেল) তবে (কুফর করতে) বাধ্য করা হলে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকলে (কাফির হবে না।) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কুফর করবে তার উপর আল্লাহর গযব, তার তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (১৬ নাহ'লঃ ১০৬)

পর্যালোচনাঃ উপরের দুইটি আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছেঃ অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণের পরও কুফর করে, শিরক করে। যারা বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচাতে এসব কাজ করে ফেলে তাদের ব্যাপারটি ভিন্ন। কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ে তারা মুনাফিক হয়ে যায়। তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ আ'যীমাত ও রুখসাতঃ বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মানতে গিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়তে হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারনে কোনো কোনো সময় দ্বীনি বিধান পালন করা কঠিন হয়ে যায়। ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। তাই এমন অবস্থার কথা বিবেচনা করে ইসলামী বিধান পালনের জন্য দুটি পথ খোলা রেখেছে ইসলামী শারীয়া'হ। অর্থাৎ ইসলামী বিধান পালনের পদ্ধতি দুইটিঃ **আ'যীমাত ও রুখসাত**। এবার আসুন! আ'যীমাত ও রুখসাত সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

আ'যীমাতঃ আ'যীমাত অর্থ দৃঢ় থাকা, অবিচল থাকা। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকার নাম আ'যীমাত।

রুখসাতঃ রুখসাত অর্থ অনুমোদন, সুযোগ। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়ে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ গ্রহন করার নাম রুখসাত।

বিধানঃ ইসলামী বিধানে আ'যীমাত ও রুখসাত দুই পদ্ধতিই অনুমোদিত। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান বা ইসলামী বিধানের উপর দৃঢ় ভাবে অবিচল থাকা মোটেই নির্বুদ্ধিতা বা নিন্দনীয় নয়। বরং এটা হল ইসলামের আ'যীমাত পদ্ধতি। আ'যীমাতের উপর অবিচল থাকলে প্রতিদান পাওয়া যায়। এপথে কষ্ট সহ্য করলে মহান আল্লাহ উপযুক্ত বিনিময় দেন, বরং আরো বাড়িয়ে দেন। এ অবস্থায় মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যায়। শহীদকে ৫টি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।
পক্ষান্তরে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে (অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে) শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিলেও পাপ হয় না বা ঈমানের ক্ষতি হয় না। এটা হল ইসলামী বিধানের রুখসাত পদ্ধতি। রুখসাত পদ্ধতিও ইসলামে অনুমোদিত এবং এর মান মর্যাদাও কম নয়।

উপমাঃ আ'যীমাত ও রুখসাতের নমুনা সাহাবাদের থেকেই পাওয়া যায়।

আ'যীমাতের জ্বলন্ত নমুনা খুবাইব রাঃ। পরিচিতিঃ তিনি খুবাইব বিন আ'দী বিন মালিক বিন আ'মির আল-আ'উসী আল-আনসারী রাঃ। তিনি স্থির স্বভাবের, দৃঢ় মনা, খ্যাতনামা বীর ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুশমনের আতঙ্ক। তিনি প্রথম দিকেই মুসলিম হয়ে ছিলেন এবং বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়াই করে ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি মক্কার নেতা হারিছ বিন আ'মির বিন নুফাইলকে হত্যা করে ছিলেন। এজন্য মক্কার নেতারা ব্যক্তিগতভাবে তার দুশমন হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিশোধের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বর্নিত আছেঃ
৪র্থ হিজরির সফর মাসে আরবের দুইটি গোত্র মদিনায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদেরকে ইসলামী বিধান ও ক্বুরআন শিক্ষা দেবার জন্য কিছু শিক্ষক পাঠানোর অনুরোধ করল। রাসূল সাঃ ১০সদস্যের একটি দল পাঠালেন। যাদের নেতা ছিলেন আ'স্বিম বিন ছাবিত আল-আনসারী রাঃ। খুবাইব ও এই দলে শামিল ছিলেন। হুযাইলের এলাকা অতিক্রম কালে বনু-লিহয়ানের প্রায় দুইশ তিরান্দাজ তাদের গতিরোধ করে আত্মসমর্পনের আহবান জানায় এবং ওয়াদা করে; আত্মসমর্পন করলে কাউকে হত্যা করা হবে না।
মুসলিম দলনেতা আ'স্বিম বিন ছাবিত বললেনঃ কোনো কাফিরের কথায় আস্বস্থ হয়ে আত্মসমর্পনে আমি রাজি নই। তিনি তীর চালিয়ে লড়াই শুরু করে দিলেন এবং তিনি সহ সাতজন সাহাবী লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। বাকি তিনজন কাফিরদের কথা বিশ্বাস করে হাতিয়ার ছেড়ে দিলেন। খুবাইব রাঃ ছিলেন এই তিনজনের একজন। একটু পর তাদের বেঁধে ফেলা হল। এক সাহাবী বললেনঃ এটা হল প্রতারণার প্রথম ধাপ। তিনি তাদের সঙ্গে যেতে আস্বিকার করলেন। ফলে বেইমানরা তাকে মেরে ফেলল। খুবাইব রাঃ ও তার সঙ্গীকে মক্কা এনে বিক্রি করা হল। হারিছ বিন আ'মির পরিবার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে খুবাইবকে কিনে নিল।
হারিছের এক মেয়ে বলেনঃ খুবাইব যখন বন্দি। একদা আমার এক ছেলে চাকু নিয়ে খুবাইবের কাছে চলে গেল। হঠাৎ দেখি খুবাইবের হাতে চাকু। আমার ছেলে তার পায়ের উপর বসা। আমি আঁতকে উঠলাম। খুবাইব বললঃ ভাবছ আমি তোমার ছেলেকে হত্যা করব? না! আমি এমন করব না। হারিছের মেয়ে বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমরা খুবাইবের মত ভাল বন্দি আর দেখিনি।
মক্কার হারামের বাইরে তানঈ'ম নামক স্থানে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে খুবাইব রাঃকে নিয়ে আসা হল। তিনি দুই রাকায়াত নামাযের সুযোগ চাইলেন। তারা সুযোগ দিল। খুবাইব রাঃ দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং বললেনঃ মন চাইছিল নামাযটা আরো দীর্ঘ করি কিন্তু করিনি। কারন তোমরা ভাববেঃ নামাযকে বাহানা বানিয়ে মরণের ভয়ে কাল ক্ষেপণ করছি।
খুবাইব রাঃ তখন ফাঁসির মঞ্চে। কাফিররা বললঃ খুবাইব! তোমার জাগায় মুহাম্মাদ হলে আজ কেমন হত? (তুমি শুধু নীতিগত ভাবে রাজি হয়ে যাও) হয়ত তোমাকে ছেড়ে দেব। খুবাইব বললেনঃ আমি বেঁচে যাব আর মুহাম্মাদ সাঃর গায়ে কাটা ফুটবে তাও আমি মেনে নেব না।
আবু-সুফিয়ান বললঃ মুহাম্মাদের প্রতি তার সঙ্গীদের ভালবাসা নজিরবিহীন। তারা খুবাইব রাঃকে ফাঁসি দিল। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। (ঘটনাটি বুখারীসহ অনেক কিতাবে বর্নিত হয়েছে)
খুবাইব রাঃর এ কাজ ছিল আ'যীমাত। আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে তিনি জীবন দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ রাহিঃও আ'যীমাতের উপর আমল করেছেন। আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকেই তিনি মার খেয়েছেন, জেলে গিয়েছেন, সহ্য করেছেন অমানবিক অত্যাচার। যুগে যুগে আরো কত উলামা ও মুসলিমগণ আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন, জীবন দিয়েছেন, শাহাদাতের মর্যাদায় ধন্য হয়েছেন।

রুখসাতের নমুনাঃ রুখাসাতের জ্বলন্ত নমুনা আ'ম্মার বিন ইয়াসার রাঃ।
পরিচিতিঃ আম্মার বিন ইয়াসার রাঃর মা সুমাইয়্যাহ ছিলেন দাসী। বাপ ইয়াসার মক্কার স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন না। ইয়াসার মক্কায় বনী-মাখজুমের আশ্রয়ে থেকে তাদের দাসী সুমাইয়্যাহকে বিয়ে করে ছিলেন। ইয়াসার পরিবার শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন এবং এজন্য তাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। শুধু ইসলামের কারনে সুমাইয়্যাহকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে এবং নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুমাইয়্যাহ রাঃ ইসলামের প্রথম শহীদ। সুমাইয়্যাহর পর তার স্বামী ইয়াসারকেও অমানবিক অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুইজনই আ'যীমতের উপর অবিচল থেকে শহীদ হয়েছেন।
আ'ম্মারের উপরও অবর্ননীয় অত্যাচার করা হয়েছে। এক পর্যায়ে আত্মরক্ষার্থে বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়েছেন আ'ম্মার। ফলে কাফিররা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। আ'ম্মার বিষয়টি নিয়ে খুব ভাবনায় ছিলেন। একদা এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অসহ্য হয়ে তাদের কথা মেনে নিয়েছি। রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমার অন্তর কি ঈমানের উপর অবিচল ছিল না? তিনি বললেনঃ জী, আমার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ তবে কিছুই হবে না। তারা বারবার করলেও কিছু হবে না। ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছেঃ
আম্মার রাঃর এ কাজটি ছিল রুখসাত। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তিনি রুখসাতের উপর আমল করে ছিলেন। এমন করা দুষের কিছু নয়।

বিঃ দ্রঃ= আক্বাইদের পরিভাষায় যাহা **"আ'যীমাত ও রুখসাত"**, ফিক্বহের পরিভাষায় ইহাকে **"ইকরাহ"** বলা হয়। ইকরাহ অর্থ বাধ্য করা, জবরদস্তী করা, হুমকি দেয়া। হানাফী ফিক্বহের একটি প্রসিদ্ধ কিতাব "মুখতাসার আল-ক্বুদূরী" যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের মাদরাসাহ সমূহে পাঠ্য বই হিসেবে পড়ানো হয়। এই কিতাবের "ইকরাহ" অধ্যায় থেকে কিছু বিধান নিম্নে পেশ করা হলঃ

- হুমকি দাতা সরকার হক বা সন্ত্রাসী, তার যদি এ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকে তবে শারীয়া'হ আইনে ইহাকে "ইকরাহ" হিসাবে গণ্য করা হয়।
- কাউকে যদি কুফর করতে বা নবীকে গালি দিতে বাধ্য করা হয়। নতুবা প্রহার বা জেলের হুমকি দেয়া হয় তবে ইহা ইকরাহ হিসাবে গণ্য হবে না। (অর্থাৎ জেল বা প্রহারের ভয়ে কুফর করা বৈধ হবে না। হত্যা বা অঙ্গ হানীর হুমকী থাকলে আত্ম রক্ষার জন্য বাহ্যত তাদের কথা মেনে নেয়া যাবে)
- যদি কুফর না করলে বা নবীকে গালি না দিলে মেরে ফেলার বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হয়, তবে ইহা "ইকরাহ" হিসেবে গণ্য হবে এবং এ হুমকি আমলে নিয়ে অন্তরে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে শুধু মুখে হুমকি দাতার কথা মেনে নিলে পাপ হবে না।
- আর হুমকি দাতার কথা না মেনে (আ'যীমাতের উপর) মারা গেলে বা অত্যাচারিত হলে আল্লাহর কাছে এর ছাওয়াব বা প্রতিদান পাবে।
- কাউকে যদি হারাম খাদ্য বা হারাম পানীয় গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং ইহা না করলে জেল বা প্রহারের হুমকি দেয়া হয় তবে (জেল বা প্রহারের ভয়ে) এমন কাজ করা বৈধ হবে না।
- হারাম খাদ্য বা হারাম পানীয় গ্রহণ না করলে যদি মেরে ফেলার বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হয় তবে তা মেনে নিতে হবে। অন্যথায় (হুমকি দাতার কথা না মেনে ক্ষতিগ্রস্থ হলে) পাপ হবে। (মানে তখন আত্মরক্ষা ফরজ হয়ে যাবে)
- সরকার (পুলিশ, আর্মি, আদালত বা ক্ষমতাধর অন্য কেউ) যদি কাউকে যিনা করতে বাধ্য করে এবং ওই ব্যক্তি বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচাতে বা অঙ্গ বাঁচাতে যিনা করে তবে এজন্য সে অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে না এবং তাকে সাজা দেয়া যাবে না।
- আর সরকার ছাড়া অন্য কেউ যিনা করতে বাধ্য করলে ইমাম আবু-হানীফার মতে সাজা দেয়া হবে। তবে ইমাম আবু-ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিঃর মতে সাজা দেয়া হবে না। (সে নিরপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ফতোয়া এর উপরই)
- কাউকে বাধ্য করে মুরাতাদ বানালে তার স্ত্রীর সাথে বিয়ে ভঙ্গ হবে না। (অর্থাৎ তার উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হবে না)
- অন্য মানুষকে হত্যা করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হলে (জীবন গেলেও) তা মানা (হত্যা করা) যাবে না। আর করে ফেললে পাপী হিসাবে গণ্য হবে। তবে এর সাজা ভোগ করবে বাধ্য কারী। (হত্যা কারী নয়।)
- বিবাহ বা তালাকের উপর কাউকে বাধ্য করা হলে এবং বাধ্য হয়ে বা ভয়ে কাজটি করে ফেললে তা হয়ে যাবে।

- কাউকে কিছু বেচতে বা কিনতে বাধ্য করা হলে (এ ক্রয়-বিক্রয় বলবত রাখা বা না রাখার ব্যাপারে) তার এখতিয়ার থাকবে। (উল্লেখিত সকল বিধানই কুদূরী থেকে নেয়া। তবে ধারা বর্ননায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে)

স্বভাবঃ ১১. মুনাফিকরা ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে জীবনের নতুন পথ তৈরি করে। ইরশাদ হচ্ছে...

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا(151)

যারা আল্লাহ রাসূলের অবাধ্য হয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করে এবং বলেঃ কিছু মানি আর কিছু মানি না। যারা ঈমান ও কুফরের মাঝে নতুন পথ বানাতে চায়; এরাই আসল কাফির। আর এসব কাফিরদের তরে অন্ধারিত আছে (জাহান্নামে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (নিসাঃ ১৫০-১৫১)

স্বভাবঃ ১২. মুনাফিকরা ফাসাদ প্রিয় জাতি। তারা দুর্নীতি ও অনিয়মে সর্বদাই সেরা হয়ে থাকে। তারা নিজের মন্দকে ভালো আর অন্যের ভালোকেও মন্দ হিসেবে উপস্থাপন করে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12)

যখন বলা হয় "যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) কর না"। তারা বলে "আমরা সংশোধন করছি"। আসলে এরাই ফাসাদকারী। কিন্তু (পাপাচার আর সংশোধন বুঝার মত) এতটুকু অনুভুতিও এদের নাই। (২ বাকারাহঃ ১১-১২)

স্বভাবঃ ১৩. মুনাফিকরা নিজেকে খুব চালাক ও বুদ্ধিমান ভাবে। তারা মুসলিম হয়েও গোপনে গোপনে কাফিরদের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং নিজের নীতি আদর্শ বিকিয়ে দিয়ে এটাকে মনে করে বুদ্ধিমত্বা। ইরশাদ হচ্ছে...

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ(14)

মুঅমিনদের সাথে সাক্ষাত করে এরা বলে "আমরাও মুঅমিন" আর শয়তানদের (ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদের) সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে "আমরা তোমাদেরই সঙ্গী" (ঈমান ও ইসলামের কথা বলে) তাদের সাথে উপহাস করছি মাত্র। (২ বাকারাহঃ ১৪)

স্বভাবঃ ১৪. মুনাফিকরা মনে করে মুঅমিনরা অন্ধ বিশ্বাসী, ধর্মান্ধ, ইসলাম ছাড়া কিছুই বুঝে না। ইরশাদ হচ্ছে..

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(49)

(বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে) মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা বললঃ ধর্ম এদেরকে (মুসলিমদেরকে) ধোকায় ফেলে দিয়েছে (এরা ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। তাইতো মাত্র ৩১৩ জন সাধারণ মানুষ প্রায় ১০০০ যুদ্ধার মোকাবিলা করতে রাজি হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেনঃ) যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে (তারা জেনে রাখুক) আল্লাহ মহাপরাক্রম শালী, মহা কৌশলী (৮ আনফালঃ ৪৯)

স্বভাবঃ ১৫. মুনাফিকরা ভোগবাদী ও জিহাদ বিমুখ হয়। সুবিধা নেওয়ার সময় তারা ধার্মিক সাজে আর ত্যাগের সময় তাদেরকে খুজে পাওয়া যায় না। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

পটভূমিঃ তবুক যুদ্ধ ছিল রাসূল সাঃর জীবনের কঠিনতম যুদ্ধ। শত্রু ছিল বিশ্ব মোড়ল রোম। সফর ছিল অনেক দীর্ঘ। দুনিয়ার হিসাবে বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল একেবারেই ক্ষীন। আবহাওয়াও ছিল প্রতিকুল, খুবই উত্যপ্ত। মদীনার একমাত্র ফসল খেজুর ঘরে তোলার সময়। তাই মুনাফিকরা এ যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু এ অভিযানে মুসলিম বাহিনীর অবিশ্বাস্য বিজয় সাধিত হল। সংখ্যায় কয়েকগুন বেশী হওয়া সত্বেও শত্রু বাহিনী যুদ্ধ না করেই পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে রাসূল সাঃ বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরে এলেন। ফিরতী পথে যুদ্ধ বিমুখ মুনাফিকদের ব্যাপারে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। এসব আয়াতের একটি হল..

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42)عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ(43)

(রাসূল সা. তবুক যুদ্ধকে জনযুদ্ধ (নাফিরু আ'ম) ঘোষণা করে ছিলেন। তথাপিও অনেক মুনাফিক এ যুদ্ধে শরীক হয়নি। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে) সম্পদ হাতের নাগালে হলে, সফর দীর্ঘ না হলে (যুদ্ধে) তারা তোমার অনুকরণ করত। কিন্তু (৬২৬কিঃ মিঃ) দীর্ঘ সফর তাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়েছে (তাই বের হয়নি। তুমি ফিরে যাবার পর) তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ সাধ্য থাকলে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে যেতাম। তারা নিজের সর্বনাশ করছে। আল্লাহ জানেন তারা মিথ্যুক। (তবুক বিজয় করে ফিরে আসার পর লোকজন মিথ্যা কসম করে নানা অজুহাত দেখাতে লাগল। রাসূল সাঃও তাদের ক্ষমা করে দিলেন। এতে নাযিল হল) তবে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা প্রমানিত হবার আগে তুমি কেন তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছ? (৯ তাওবাহঃ ৪২-৪৩)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে..

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45)

যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করবে এটাই স্বাভাবিক। তারা কখনো) জিহাদ থেকে (অব্যাহতির) আনুমতি চাইতে পারে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের ব্যাপারে খুবই অবগত। (জিহাদ থেকে অব্যাহতির) অনুমতি কেবল তারাই চাইতে পারে যারা (প্রকৃত পক্ষে) আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না। তাদের অন্তরে থাকে সংশয় এবং তারা এ সংশয়ে ঘুর্নিমান। (জিহাদ থেকে দূরে থাকার জন্য বাহানা বানানো মুনাফিকী।) (৯ তাওবাহঃ ৪৪-৪৫)

জ্ঞাতব্যঃ প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারেরই প্রতিরক্ষানীতি বা যুদ্ধনীতি থাকে। প্রতিরক্ষানীতি ছাড়া কোনো দেশ বা জাতি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ন জীবন আদর্শ। ইসলামে যেমন ধর্মীয় বিষয়াদি রয়েছে তেমনি রয়েছে সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি। দেশ জাতি ও সরকার গঠন এবং পরিচালনা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলাম তার জাতির জন্য যে প্রতিরক্ষানীতি ঠিক করে দিয়েছে এরই নাম "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"। দেশ জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন। তাই এটাকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলা হয়।

স্বভাবঃ ১৬. সমাজে ফিতনাহ ফাসাদ ছড়িয়ে দেয়া, নানা ভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখা এবং ভীরুতা ও কাপুরুষতা মুনাফিকদের অন্যতম বদ-স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছে..

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48)

(মুসলিমগণ! মনে রাখবে) তোমাদের সঙ্গে বের হলে এরা নানা ঝামেলা সৃষ্টি করত/করবে, ফিতনাহ ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে ছুটাছুটি করত/করবে। তাদের কথা শুনার লোকও তোমাদের মাঝে কম নয়। পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আল্লাহ খুবই অবগত। তারা আগেও (বদর, অহুদ, হুনাইন যুদ্ধে) ফিৎনাহ করেছে, তোমার অনেক কিছুই উলট পালট করে দিয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য এসেছে, আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু তারা এটা পছন্দ করেনি। (তাওবাহঃ ৪৭-৪৮)

স্বভাবঃ ১৭. মুনাফিকরা নিজেকে সংশোধন করতে চায় না। তবে ভালো সাজতে পছন্দ করে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49)

পটভূমিঃ আরবের একটি প্রসিদ্ধ গুত্র বানী-সালামাহ। বানী-সালামহর নেতা ছিল জাদ্দ বিন ক্বাইস। জাদ্দ ছিল লম্পট স্বভাবের। অর্থ সম্পদ আর নেতৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে সুন্দরী নারীদের নিয়ে অবৈধ ফুর্তি করা ছিল তার স্বভাব। জাদ্দ বাহ্যত মুসলিম হলেও নীতি আদর্শের তোয়াক্কা খুরাই করত। দ্বীন ইসলাম ও নীতি আদর্শের চেয়ে দুনিয়ার সার্থ, ফুর্তি ও বিলাসিতাটাই তার কাছে বড় ছিল। যুদ্ধ ও জিহাদের প্রতি সর্বদাই তার অনিহা ছিল। তবুকে বাস করত বানী-আসফার। বানী-আসফারের মেয়েরা ছিল খুব রূপসী। তাদের সুন্দর্যের কথা আরবে খ্যাত ছিল। তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল সা. বললেনঃ জাদ্দ! বানী-আসফারের নারীদের দাসী বানাবে না? জাদ্দ বললঃ সবাই জানে নারীদের প্রতি আমি দুর্বল। বানী-আসফারের নারীদের দেখলে আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। তাই আমাকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিন, আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না। (দেখে নিনঃ কুরতুবী, জালালাইন) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

তাদের কেউ কেউ বলেঃ আমাকে অব্যাহতি দিন, আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না। জেনে রাখো! তারা ফিৎনার মাঝেই ডুবে আছে। আর এসব কাফিরদের বেষ্টন করে আছে জাহান্নাম। (৯ তাওবাহঃ ৪৯)

স্বভাবঃ ১৮. মুনাফিকরা মুসলিম হলেও কাফিরদের নীতি, আদর্শ, সংস্কৃতি, ইত্যাদি তাদের খুব পছন্দ। তাই তারা কাফিরদের বিজয় কামনা করে। তারা মুসলিমদের বিজয়ে ব্যথিত আর পরাজয়ে আনন্দিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50)

তোমার কল্যাণ (বিজয়) হলে তাদের খারাপ লাগে আর তোমার মুসীবতে (পরাজয়ে) তারা বলেঃ আমরা আগেই (অবস্থা বুঝে) সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম। (তোমাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা শোনে) তারা খুশী হয়ে ফিরে যায়। (৯ তাওবাহঃ ৫০)

স্বভাবঃ ১৯. মুনাফিকরা দুনিয়া লোভী হয়। তারা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। তাই সকল কাজেই দুনিয়ার স্বার্থটা আগে দেখে। দুনিয়া পেলে তারা খুশী হয় আর না পেলে দুঃখিত। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58)

তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ সাদাকাহ বন্ঠন নিয়ে তোমাকে তিরস্কার করে (বলে মুহাম্মাদ তার আত্মীয়স্বজনকে বেশী দেন আর আমাদেরকে কম।) আসলে দুনিয়ার সম্পদ দিলে তারা খুশী হয় আর না দিলে বেজাড়। (৯ তাওবাহঃ ৫৮)

স্বভাবঃ ২০. মুনাফিকরা স্বার্থপর হয়, স্বার্থের জন্য তারা দ্বীন-ধর্ম, নীতি আদর্শ সব বিসর্জন দিতে পারে। স্বার্থে আঘাত এলে তারা দেশ ও জাতীর বিরোদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রপাগান্ডায় মেতে উঠে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61)

তাদের কেউ কেউ নবীকে কষ্ট দেয়, বলেঃ লোকটি "কান" (এটা একটা প্রবাদ বাক্য। আরব সমাজে যে ব্যক্তি সব কথায় কান দেয় তাকে "কান" বলা হত। মুনাফিকরা বলতঃ রাসূল সা. "কান" তিনি সকলের কথা শুনেন, সব কথায় কান দেন) বলে দাওঃ তিনি "কান" হলেও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তিনি আল্লাহর উপর ঈমান রাখেন, মুঅমিনদের বিশ্বাস করেন। তিনি মুঅমিনদের জন্য রহমত। যারা রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (৯ তাওবাহঃ ৬১)

স্বভাবঃ ২১. অকারনে কসম খাওয়া মুনাফিকদের অন্যতম বদ-স্বভাব। নিজের মিথ্যা কথা বিশ্বাস করাতে এবং মানুষকে খুশী করতে তারা অকারনে কসম খায়। ইরশাদ হচ্ছে..

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62)

তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর নামে কসম করে। (তাদের মিথ্যা কসমে তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যেও না) তারা মুঅমিন হলে আল্লাহ ও রাসূলই তাদের উপর সন্তুষ্ট হতেন /সন্তুষ্ট থাকতেন। (৯ তাওবাহঃ ৬২)

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96)

(মদীনায়) ফিরে যাবার পর তোমাদেরকে আশ্বস্থ করতে তারা আল্লাহর নামে (মিথ্যা) কসম করবে, যেন তোমরা তাদেরকে মাফ করে দেও। (শোনো!) তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। কারণ তারা অপবিত্র আর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এটাই তাদের কর্মফল। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা কসম করে। তোমরা সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ কখনো ওই পাপিষ্ঠদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না (৯ তাওবাহঃ ৯৫-৯৬)

স্বভাবঃ ২২. মুনাফিকদের মুখে মিঠা অন্তরে বিষ। তারা সময় ও সুযোগ বুঝে কথা বদলায় এবং নানা জনের সাথে নানা প্রকার কথা বলে। বাহ্যত সাধু সাজলেও তাদের অন্তর থাকে কলুষিত। তাই অন্তরের গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে তারা সদা আতঙ্কিত থাকে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64)

মুনাফিকরা আতঙ্কিত থাকেঃ কোনো সূরাহ নাযিল হয়ে যদি তাদের মনের কথা ফাঁস করে দেয়। বলে দাওঃ তামাশা করতে থাকো। তোমরা যে আশঙ্কা করছ আল্লাহ এটা প্রকাশ করে দেবেনই। (মুনাফিকদের ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত, তামাশার মতই অর্থহীন, তামাশার মত। আখেরাতে এসব কোনোই কাজে আসবে না) (৯ তাওবাহঃ ৬৪)

স্বভাবঃ ২৩. স্বভাবগতভাবেই মুনাফিকরা কুচক্রি হয়। তারা চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে। দ্বীন, দ্বীনি ব্যক্তিত্ব ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা মশকারা করা মুনাফিকদের অন্যতম বদ-স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)

(তারা আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর কালাম ও মুঅমিনদের সম্পর্কে কটু কথা বলে। আর) জিজ্ঞেস করলে বলে "ঢং করেছি" বলঃ তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত (কিতাব, বিধান) আর আল্লাহর রাসূল নিয়েও ঢং কর?
বাহানা বানিও না। ঈমানের পর তোমরা কুফর করে ফেলেছ। তাই তোমাদের কাউকে (যে ব্যক্তি তাওবাহ করে ভালো হয়ে যাবে তাকে) মাফ করা হলেও অন্যদেরকে অবশ্যই সাজা দেয়া হবে। কারণ তারা পাপিষ্ঠ। (তাওবাহঃ ৬৫-৬৬)

স্বভাবঃ ২৪. ভালো কাজে বাঁধা দেয়া এবং মন্দ কাজে উৎসাহিত করা মুনাফিকদের আরেকটি বদ-স্বভাব। তারা নানাভাবে নানাছলে ভালো কাজে বাঁধার সৃষ্টি করে আর মন্দ কাজে উৎসাহিত করে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে..

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68)

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের ওয়ালী। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে আর ভালো থেকে বিরত রাখে, তারা (ভালো কাজে) নিজের হাত সংকোচিত করে রাখে। তারা আল্লাহকে (আল্লাহর বিধান মেনে চলাকে) ভুলে থাকে, ফলে আল্লাহও তাদের (ক্ষমার ব্যাপারটা) ভুলে থাকবেন। মুনাফিকরা আসলেই পাপিষ্ঠ। মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী আর কাফিরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট। তাদের প্রতি লা'নত। তাদের তরে চিরস্থায়ী আযাব। (৯ তাওবাহঃ ৬৭-৬৮)

লা'নত পরিচিতিঃ লা'নত অর্থ বঞ্চিত করা। আল্লাহর লা'নত মানে হচ্ছে আল্লাহর রহমত থেকে চিরতরে বিঞ্চিত হয়ে যাওয়া। আল্লাহর লা'নতের ফলে দুনিয়াতে হয় হেদায়াত বঞ্চিত আর আখেরাতে জান্নাত বঞ্চিত।

স্বভাবঃ ২৫. ওয়াদা ভঙ্গ মুনাফিকদের আরো একটি বদ-স্বভাব। তারা সহজেই ওয়াদা করে এবং সহজেই ভঙ্গ করে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77)

তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেঃ "আল্লাহ যদি আমাকে সম্পদ দান করেন তবে আমি সাদাকাহ করব এবং ভালো হয়ে যাব" আর সম্পদ দেয়ার পর (যাকাত দিতেও) কার্পন্য করে, (ওয়াদা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ফলে আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকীর ছাপ লাগিয়ে দেন, যা সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত লেগে থাকবে। আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ আর মিথ্যা বলার সাজা এমনই হয়। (৯ তাওবাহঃ ৭৫-৭৭)

স্বভাবঃ ২৬. মুনাফিকরা ব্যক্তিগত এবাদত পছন্দ করে কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে না। তারা জিহাদকে ঘৃনা করে। জিহাদ থেকে দূরে থাকে এবং জিহাদ থেকে বেঁচে থাকতে পারলে খুশী ও আনন্দিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82)

পটভূমিঃ তাবুক যুদ্ধকে জনযুদ্ধের গুরুত্ব দিয়ে সবার অংশ গ্রহণ আবশ্যক বলে অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন রাসূল সাঃ। তথাপিও কিছু লোক যুদ্ধ থেকে বিরত থেকে ছিল। তারা ভেবে ছিল এ যুদ্ধ বড়ই ঝুঁকি পূর্ন। তাই যুদ্ধে না গিয়ে তারা মনে মনে খুশী ছিল। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

যারা রাসূলের কথা অমান্য করে বসে থেকেছে, যুদ্ধে না গিয়ে খুশী হয়েছে। যারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা পছন্দ করে না এবং (অন্যদের) বলেছেঃ এই গরমে বের হইও না। তাদের বলে দাওঃ জাহান্নামের আগুন অধিক গরম, যদি তারা বুঝত। (যুদ্ধে না গিয়ে) তারা যা অর্জন (মহাপাপ) করেছে এর পরিণতির কথা ভেবে তারা যেন কম কম হাঁসে আর বেশী বেশী কাঁদে। (৯ তাওবাহঃ ৮১-৮২)

স্বভাবঃ ২৭. মুনাফিকরা দ্বীনি কাজে গাফিল ও উদাসীন থাকে। আর জিজ্ঞেস করলে ভবিষ্যতে করবে বলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)

(তবুক যুদ্ধ থেকে) আল্লাহ যদি তোমাকে ফিরিয়ে নেন তবে (দেখবে) তাদের কিছুলোক (অন্য যুদ্ধে) বের হবার অনুমতি চাইবে। (তখন) বলে দিওঃ "তোমরা আমাদের সাথে বের হতে পারবে না, দুশমনের সাথে যুদ্ধও করতে পারবে না"। কারণ প্রথম বার (যুদ্ধকালে) তোমরা বসে থেকেছ (আর এটাই তোমাদের স্বভাব) তাই তোমরা যুদ্ধবিমুখ লোকদের সঙ্গে বসেই থাকবে। তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে তার জন্য সালাত (জানাজা/দোয়া) করবে না এবং তার কবরেও দাড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায় মৃত্যু বরন করেছে। (৯ তাওবাহঃ ৮৩-৮৪)

স্বভাবঃ ২৮. মুনাফিকরাও মসজিদ বানায়, মাদরাসাহ বানায়, মসজিদ পরিচালনা করে, মাদরাসাহ পরিচালনা করে। তবে তারা এসব করে..

- নিজেদের দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থে,
- নিজেদের অপকর্ম ও দুষ্কৃতি আড়াল করার জন্য,
- নিজেদের দল ভারি করার জন্য,
- দলাদলি, বিভক্তি ও বিভাজন সৃষ্টির জন্য তথা নানা কুমতলব হাসিল করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে..

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)

পটভূমিঃ রাসূল সাঃর এক সাহাবী হানযালাহ বিন আবু-আ'মির। হানযালাহ অহুদ যুদ্ধের আগের দিন জামিলাহ নামী এক মেয়েকে বিয়ে করেন। (এক বর্ননা মতে রাসূল সা. নিজে এ বিয়ের মোহর পরিশোধ করে ছিলেন) হানযালাহ রাসূল সা. থেকে অনুমতি নিয়ে অহুদ যুদ্ধে না গিয়ে নব বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে রয়ে যান।

ফজর সালাতের পর আবার স্ত্রীর কাছে যান হানযালাহ। এমন সময় যুদ্ধের আহবান শোনে (ফরজ গোসল না করেই) ছুটে যান রণাঙ্গনে। যুদ্ধ করে তিনি শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধের পর শহীদদের দাফনকালে রাসূল সা. বললেনঃ আল্লাহর ফিরিস্তারা হানযালাহকে গোসল করিয়েছে। তখন থেকে তার নাম হয়ে যায় "গাসীলু-ল-মালাইকাহ" মানে যাকে ফিরিস্তা গোসল করিয়েছে।

হানযালাহ রা.র পিতা আ'মির ছিল মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইর বন্ধু। রাসূল সা.র মদীনায় আগমন এবং মদীনাহ কেন্দ্রিক ইসলামী সরকার ও সমাজ তাদের পছন্দ ছিল না। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বাহ্যত মুসলিম হয়েছিল আর আবু-আ'মির ছিল প্রকাশ্য কাফির। আবু-আ'মির জাহিলী যুগে রাহিব নামে খ্যাত ছিল। তাকে বলা হত আ'মির আল-রাহিব।

আ'মির আল-রাহিব অহুদ যুদ্ধে মদীনাহ থেকে পালিয়ে গিয়ে মুশরিকদের পক্ষ নিয়েছিল এবং যুদ্ধের পর মক্কা গিয়ে মুশরিকদের সাথে বসবাস শুরু করেছিল। রাসূল সাঃ তাকে বলতেন আ'মির আল-ফাসিক। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর আ'মির শামদেশে চলে যায়। সেখানে থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই মারা যায়।

মদীনাহর নিকটতম এলাকা ক্বুবা। আ'মার বিন আ'উফ ও গু'মার বিন আ'উফ নামে দুই ভাই ছিল এখানকার আদি বাসিন্দা। এ দুই ভাইয়ের বংশধরগণ বানী-আ'মার ও বানী-গু'মার নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

রাসূল সাঃর আগমনের পর মদীনাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যায়। ইসলামের প্রভাবে মানুষের জীবনে বিপ্লবী পরিবর্তন আসে। বানী-আ'মার ও বানী-গু'মার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়।

বাণী আ'মার নেতারা ছিল সাচ্চা মুসলিম। তারা মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদের সবকিছু রাসূল সাঃর উপর ছেড়ে দিয়েছিল এবং রাসূল সাঃর ইচ্ছায় নিজেরদের এলাকায় একটি মাসজিদ নির্মান করেছিল যা মাসজিদ ক্বুবা নামে খ্যাত। পক্ষান্তরে বাণী গু'মার নেতারা ছিল মুনাফিক। তারা ইসলামী সমাজ ও বহিরাগত মুসলিমদের সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।

আমির আল-রাহিব বণী-গু'মারের লোক। সে শামদেশে গিয়ে রাজা ক্বাইসারের কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন করে। সে চাচ্ছিল রোমান বাহিনী মাদীনাহ আক্রমণ করে ইসলামী সমাজ ও সরকার ভেঙ্গে দিক এবং ইসলামের নবী মুহাম্মাদকে হত্যা করুক। তার পরিকল্পনা বস্তবায়নে সহায়তার জন্য তারই পরামর্শে বানী-গু'মার এলাকায় একটি মাসজিদ বানানো হয়। বাহ্যত প্রচার করা হয়ঃ এলাকার মানুষের নামাযের জন্য মাসজিদটি বানানো হচ্ছে। কিন্তু আসলে মাসজিদটি বানানো হয়ঃ

- আ'মির আল-রাহিবের লোকজনকে আশ্রয় দেবার জন্য
- ইসলামী সমাজ ও সরকারের বিরুদ্ধে আগত লোকজনকে সহায়তা করার জন্য
- মুসলিম সমাজে বিভেদ ও বিভক্তি তৈরি করার জন্য।

মাসজিদটি বানানোর পর উদ্বোধনের জন্য রাসূল সাঃকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু রাসূল সাঃ যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি। তিনি তাবুক থেকে ফিরে আসার পরে আসবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করেন। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়ঃ

যে বা যারা..

- (ইসলাম ও মুসলিমদের) ক্ষতি সাধনের জন্য,
- কুফর (ইসলামের শত্রুদের সাহায্য) করার জন্য,
- মুঅমিনদের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরী করার জন্য,
- আল্লাহ ও রাসূল বিরোধীদের আশ্রয় দেবার জন্য, মাসজিদ বানায় এবং কসম করে বলেঃ সৎ উদ্দেশ্যেই আমরা কাজটি করেছি (এরা মুনাফিক।) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেনঃ এরা মিথ্যুক। তুমি এ মাসজিদে দাড়াবে না। যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম থেকেই তাকওয়ার উপর এটাই তোমার সালাতের উপযুক্ত। এতে (কুবা মাসজিদ ও মসজিদ নববীতে) কিছু মানুষ রয়েছে যারা পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। আল্লাহ পছন্দ করেন পরিচ্ছন্নদের। (তাওবাহঃ১০৭-১০৮)

আয়াতের উপর রাসূল সা.র আমলঃ আয়াতটি নাযিলের পর রাসূল সা. মালিক বিন দুখশুম, মায়া'ন বিন আ'দি, আ'মির বিন সাকান এবং ওয়াহশী (যিনি হামযা রা.কে হত্যা করে ছিলেন, পরে মুসলিম হয়ে ছিলেন এবং ভন্ড নবী মুসাইলামাহকে হত্যা করেছিলেন।) রাঃহুমকে ডেকে পাঠালেন। এবং (৪ সদস্যের একটি ঝটিকা বাহিনী গঠন করে) বললেনঃ দ্রুত ছুটে যাও। ওই পাপিষ্ঠদের মসজিদটি ধ্বংস করে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দাও। আদেশ পেয়ে উনারা দ্রুত ছুটে গেলেন, মালিক বিন দুখশুম উনার ঘর থেকে আগুন নিলেন এবং ওই মাসজিদটি জ্বালিয়ে ভষ্ম করে ধ্বংস করে দিলেন। (তাফসীর কুরতুবীঃ উক্ত আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে)

আইন ও বিধানঃ মল ত্যাগের পর টিসু, কাপড়, মাটি, পাথর বা এ জাতীয় অন্যকিছু দিয়ে মলদ্বার মুসে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট। তবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা উত্তম।

স্বভাবঃ ২৯. মুনাফিকরা আল্লাহ্ ও রাসূলের কথার চেয়ে বস্তুবাদকে বেশী বিশ্বাস করে। তারা বস্তুবাদী শক্তিতে ভীত হয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের দেওয়া সুসংবাদে আস্থাহীন হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12)

(খন্দক যুদ্ধে) শত্রুরা যখন উপর নীচ (পার্বত ও সমতল) দুই দিক থেকে ধেয়ে আসছিল (আরবের মিত্র বাহিনী দেখে) তোমাদের চুখ ভড়কে যাচ্ছিল, প্রান কন্ঠাগত হয়ে আসছিল, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে কুধারনা পোষণ করছিলে। তখনই মুঅমিনদের পরীক্ষা করা হয়েছে, মারাত্মকভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছে। তখন মুনাফিকরা আর (মুনাফিকীর রোগে) রোগ্ন অন্তরের লোকেরা বলছিলঃ আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া (বিজয়ের) প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। (৩৩ আহযাবঃ ১০-১২)

স্বভাবঃ ৩০. মুনাফিকরা মৃত্যু ভয়ে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকে এবং অন্যদেরকে পালাতে প্ররোচিত করে। তবে অস্ত্রের যুদ্ধে ভীত হলেও কথার যুদ্ধে তারা খুবই পটু হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14)

কিছুলোক বলছিলঃ হে ইয়াছরিব (মদীনা) বাসী! (আজ শত্রুর মোকাবিলায়) তোমরা দাড়াতেও পারবে না, তাই (ঘরে) ফিরে যাও। কেউ কেউ নবীর কাছে অনুমতি চেয়ে বলছিলঃ আমাদের ঘর অরক্ষিত, আসলে অরক্ষিত নয়, তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু পালিয়ে যাওয়া। শত্রু শহরে ঢুকে পড়লে এবং ফিৎনার (শিরকের) আহবান করলে তারা তাই করত, বিলম্ব তারা কমই করত। (৩৩ আহযাবঃ ১৩-১৪)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19)

যারা (যুদ্ধ থেকে) পালিয়ে থাকে এবং অন্য ভাইদেরকে বলেঃ আমাদের সঙ্গে থাকো; আল্লাহ তাদের খুব জানেন। যুদ্ধে তারা কমই যায়। তোমাদের কল্যাণে তারা সদাই কৃপণ। তুমি দেখবেঃ ভীতির সময় এলে তারা চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে, যেন তাদের উপর মৃত্যু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ভীতি (যুদ্ধাবস্থা) চলে গেলে তেজস্বী যবান দিয়ে তোমাদের সাথে গলাবাজি করবে। কল্যাণ কাজে তারা খুবই কৃপণ। (যারা এমন করে) এরা মুঅমিন নয় (আল্লাহ যুদ্ধ ফরজ করেছেন আর এরা যুদ্ধ পছন্দ করে না। তাই এদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে) আল্লাহ এদের সকল আ'মাল বরবাদ করে দিয়েছেন। আর এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ। (৩৩ আহযাবঃ ১৮-১৯)

স্বভাবঃ ৩১. মুনাফিকরা কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে কাফিরদের সাথে মিত্রতা করে এবং মুঅমিনদের জন্য নানা সমস্যা তৈরি করে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (48)

কোনো কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য কর না, তাদের দেওয়া কষ্ট উপেক্ষা করে চল এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। রক্ষক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৩৩ আহযাবঃ ৪৮)

স্বভাবঃ ৩২. তাকদীরের ব্যাপারে মুনাফিকদের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে নড়বড়ে। কোনো অঘটন ঘটলে মানুষকে দুষারোপ করা মুনাফিকদের আরেকটি স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168)

(অহুদে) দুই দলের মোকাবিলাকালে তোমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এটা আল্লাহর অনুমোদনেই হয়েছে। তিনি এমন করেছেন মুঅমিনদের ব্যাপারে বাস্তবে জেনে নিতে এবং মুনাফিকদের ব্যাপারটিও বাস্তবে জেনে নিতে। যাদের বলা হয়েছিলঃ আল্লাহর পথে (আক্রমনাত্মক) যুদ্ধ কর অথবা (মদিনায় থেকে দুশমনকে) প্রতিহত কর। তখন তারা বলেছিলঃ আমরা যদি এটাকে যুদ্ধ (জিহাদ) মনে করতাম তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গী হতাম। তারা সেদিন ঈমানের থেকে কুফরের বেশী নিকটতম ছিল। তাদের মুখে ছিল এক, অন্তরে ভিন্ন। আল্লাহ জানেন তাদের গোপনীয় সকল বিষয়। তারা নিজে (যুদ্ধ থেকে) বিরত থাকে আর অন্যদের ব্যাপারে বলেঃ আমাদের কথা মানলে এভাবে মরতে হত না। বলঃ তোমরা সত্য হলে মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা কর। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৬৬-১৬৮)

স্বভাবঃ ৩৩. মুনাফিকরা তাদের ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কুফর গ্রহণ করে। ঈমান বিসর্জন দিয়ে কুফর আমদানী করা মুনাফিকদের অন্যতম বদ-স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177)

তারা (স্বভাবগতভাবেই) কুফরের দিকে ধাবমান থাকে; তাই তাদের নিয়ে ভেব না। তারা আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান; তাদের জন্য আখেরাতে কিছুই না থাকুক। তাদের তরে কঠিন আযাব। যারা ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণ করে তারা আল্লাহর ক্ষতি করতে পারে না। তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৭৬-১৭৭)

৩য় অনুচ্ছেদঃ মুনাফিকের পরিণতি

মুনাফিকী আসলে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে প্রতারনা ও বিশ্বাসঘাতকতার মত জঘন্যতম অপরাধ। যেহেতু এ প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় স্বয়ং আল্লাহর সাথে তাই এর পরিণামও খুবই ধ্বংসাত্বক ও ভয়াবহ। কুরআন ও হাদীছে মুনাফিকীর পরিণাম সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। এর কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করা হল।

পরিনতিঃ ১. মুনাফিকরা বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক হয় তাই তারা নেতৃত্বের অযোগ্য। কোনো মুনাফিককে নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া অন্যায় এবং মুনাফিকের আনুগত্য করা পাপ। ইরশাদ হচ্ছে...

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2)

হে নবী! আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর (তথা সকল প্রকার কুফর, শিরক ও মহাপাপ থেকে বিরত থাকো।) আর (নীতিগতভাবে) কোনো কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য মেনে নিও না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। প্রভু থেকে আগত ওহীর অনুকরণ কর। (মনে রাখো!) তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ এসব সম্পর্কে অবগত। (৩৩ আহযাবঃ ১-২)

পরিনতিঃ ২. মুনাফিকদের প্রতি আল্লাহ্ চিরতরে অসন্তুষ্ট ও গুস্বা হয়ে যান আর কখনো তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। ইরশাদ হচ্ছে..

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96)

(মদীনায়) ফিরে যাবার পর তোমাদের আশ্বস্থ করতে তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর নামে (মিথ্যা) কসম করবে, যেন তোমরা তাদেরকে মাফ করে দেও। (শোনো!) তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করে চলবে। কারণ তারা অপবিত্র, তাদের ঠিকানা

জাহান্নাম। আর এটাই তাদের কর্মফল। তারা কসম করে যেন তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাও। (জেনে রাখো!) তোমরা যদি সন্তুষ্ট হয়েও যাও তবুও আল্লাহ কখনো ওই পাপিষ্ঠের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। (৯ তাওবাহঃ ৯৫-৯৬)

পরিনতিঃ ৩. পাপের পরিণতিতে মুনাফিকদের অন্তর কালো হয়ে যায়। তাদের অন্তরে মোহর লাহিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা আর ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে না, সঠিক পথ ও ভুল পথ নির্নয় করতে পারে না। তারা চিরতরে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (87)

তাদের (মুনাফিকদের) ধনবল ও জনবল যেন তোমার পেরেশানীর কারণ না হয়। দুনিয়াতে এসব দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিতে চান। যেন তারা (এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং) কাফির অবস্থায়ই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। যখন কোনো সূরাহ নাযিল হয় (এবং তাতে বলা হয়) আল্লাহর উপর ঈমান আন আর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর। তখন তাদের (মুনাফিকদের) সামর্থবান ব্যক্তিরাও (জিহাদে না যাবার) অনুমতি চেয়ে বলেঃ অনুমতি দিন, ঘরবৈঠি লোকদের সঙ্গে আমরাও বসে থাকব। (জিহাদ থেকে) পিছিয়ে থাকা লোকদের সঙ্গী হয়ে তারা খুশী হয়। তাই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে আর তারা (দ্বীনের কথা) বুঝতে পারে না। (৯ তাওবাহঃ ৮৫-৮৭)

পরিনতিঃ ৪. মুনাফিকরা ঈমান গ্রহণের পর কুফর করে। তাই তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। তাদের জন্য অবধারিত হয় কঠোর আযাব। ইরশাদ ইচ্ছে..

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74)

পটভূমিঃ একদা কতিপয় মুনাফিক রাসূল সাঃ সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করল। একজন সাহাবী জানিয়ে দিলে রাসূল সা. তাদের ডেকে আনলেন। তারা আল্লাহর নামে কসম করে বিষয়টি অস্বীকার করল। (দেখুন সূরাহ মুনাফিকূনঃ ৭,৮)

তবুক থেকে ফেরার পথে ১২জন মুনাফিক রাসূল সা.কে হত্যার সংকল্প করে রাতের আঁধারে আক্রমণ করে বসল। অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনে সাহাবগণ এগিয়ে এলে তারা পালিয়ে গেল। এর প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলেঃ তারা এমনটি বলেনি। অথচ তারা এসব কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফর করেছে। তারা (রাসূলকে হত্যার) যে সংকল্প করেছিল এটা কার্যকর করতে পারেনি। তারা (মুসলিমদের সাথে) শত্রুতা রাখে অথচ আল্লাহ ও রাসূল তাদের উপর দয়া করেছেন, তাদের অভাব দূর করে দিয়েছেন (রাসূল তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে কাজ করেন আর তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরন করে।) এখন তাওবাহই তাদের জন্য একমাত্র কল্যাণের পথ। অন্যথায় তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন সাজা দেওয়া হবে। তখন কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না, করতে পারবে না কোনো সাহায্য। (৯ তাওবাহঃ ৭৪)

পরিনতিঃ ৫. মুনাফিকদের ঈমান নষ্ট এবং অকার্যকর হয়ে যায়। তাই তারা মানুষের চুখে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। তাদের তরে লাঞ্ছনার আযাব। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করে (তথা অবাধ্য হয়) যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করে এবং বলেঃ কিছু মানি আর কিছু মানি না। যারা ঈমান ও কুফরের মাঝে নতুন পথ বানাতে চায়; এরাই আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে অঙ্কারিত আছে (জাহান্নামে) লাঞ্ছনার আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০-১৫১)

পরিনতিঃ ৬. আল্লাহ্ মুনাফিকদের অবকাশ দেন, পাপ করার সুযোগ দেন। ফলে তারা পরিপক্ক কাফির হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178)

যারা (মুনাফিকরা) দ্রুত কুফরের দিকে ধাবমান হয়; তুমি তাদের নিয়ে ভেব না। তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান আখেরাতে যেন তাদের জন্য কিছুই না থাকে। তাদের তরে কঠিন আযাব। ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণকারীরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। কাফিররা

যেন না ভাবে আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আমরা তাদেরকে অবকাশ দেই যেন তারা পাপ করে। তাদের তরে অবধারিত লাঞ্ছনার আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৭৬-১৭৮)

পরিনতিঃ ৭. মুনাফিকদের কোনো আ'মালই আল্লাহর কাছে কবুল হয় না, তাদের সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তারা নিজেদের নেক কাজের জন্য আখেরাতে কোনো ছাওয়াবই পাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54)

পটভূমিঃ মুসলিমগণ যুদ্ধে গেলে মুনাফিকরা অপেক্ষা করতঃ বিজয়ের সংবাদ আসে, না হতাহতের? অথচ বিজয় বা শাহাদাত উভয় সংবাদই মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়..

বলে দাওঃ আমরা তাই পাই যা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের মাওলা। মুঅমিনদের উচিত শুধুই আল্লাহর উপর ভরসা করা। (আমরা যুদ্ধে বের হলে) তোমরা দুই সংবাদের (শাহাদাত অথবা বিজয়) একটির জন্য অপেক্ষা কর, আসলে উভয়টিই আমাদের জন্য কল্যাণকর। আমাদের আশঙ্কা (মুনাফিকির কারনে) আল্লাহ তোমাদেরকে সাজা দিবেন, হয়ত তিনি নিজে অথবা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষায় থাকো, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। বলে দাওঃ তোমরা ইচ্ছায় দান কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের দান কবুল হবে না। কারণ তোমরা (কুফর শিরকের মত মহা অপরাধে) অপরাধী। তাদের দান-খয়রাত কবুল না হবার কারনঃ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করে, তারা সালাতে আসে অলস ভাবে আর দান করে অখুশী হয়ে। (৯ তাওবাহঃ ৫১-৫৪)

পরিনতিঃ ৮. মুনাফিকরা দুনিয়ার জীবনে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আখেরাতে কাফির মুশরিকদের সঙ্গী হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73)

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে আল্লাহ অবশ্যই আযাব দেবেন। আর মুঅমিন পুরুষ ও মুঅমিনাহ নারীর তাওবাহ কবুল করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৩৩ আহযাবঃ ৭৩)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140)

আল্লাহ তদীয় কিতাবে তোমাদের জন্য (যেসব বিধান) নাযিল করেছেনঃ (এর একটি হল) তোমরা যখন শোনবে (কোথাও) আল্লাহর বিধান নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, কুফর করা হচ্ছে, তখন তোমরা এদের সাথে বসে থাকবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় ফিরে যায় (কারণ তখন বসে থাকার মানে হবে নীরব সমর্থন। আর কুফরের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করাও কুফর হয়।) নতুবা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (৪ নিসাঃ ১৪০)

পরিনতিঃ ৯. মুনাফিকদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি। তাদেরকে অবশ্যই সাজা পেতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62)

মদীনার মুনাফিকরা, রোগ্ন মনের লোকেরা, রটনাকারীরা (পাপাচার ও গাদ্দারী) থেকে বিরত না হলে আমি তাদের বিরোদ্ধে (পদক্ষেপ নেয়ার জন্য) তোমাকে ক্ষমতা দেব। তখন তারা কমই তোমার সাথে অবস্থান করতে পারবে। এরা হল অভিশপ্ত, তাই এরা যেখানেই অবস্থান গড়বে সেখান থেকেই ধরে এনে (পাপ অনুপাতে প্রয়োজনে) মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। এটাই আল্লাহর রীতি, অতীতকাল থেকেই এ রীতি চলমান। আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (৩৩ আহযাবঃ ৬০-৬২)

পরিনতিঃ ১০. মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা করা, করব জিয়ারত করা এবং তার জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। ইরশাদ হচ্ছে..

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)

(তবুক যুদ্ধ থেকে) আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে নেবার পর তাদের কিছুলোক (ভবিষ্যত যুদ্ধে) বের হবার জন্য অনুমতি চাইবে। বলে দাওঃ তোমরা আমাদের সাথে বের হতে পারবে না, দুশমনের সাথে যুদ্ধও করতে পারবে না। কারণ প্রথম বার (যুদ্ধের কথা বলা হলে) তোমরা বসে থেকেছ। ভবিষ্যতেও পিছনে থাকা লোকদের সঙ্গে বসেই থাকবে (এটাই তোমাদের

সভাব) তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনো তার সালাত (জানাজা, দোয়া) করবে না, তার কবরেও দাড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। (৯ তাওবাহঃ ৮৩-৮৪)

পরিনতিঃ ১১. মুনাফিকরা আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া থেকে চিরতরে বঞ্চিত, তারা চির জাহান্নামী। ইরশাদ হচ্ছে..

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80)

(হে নবী) তাদের (মুনাফিকদের) মাগফিরাতের দোয়া করা বা না করা তোমার জন্য বরাবর। তুমি (নবী) সত্তর বার তাদের মাগফিরাতের দোয়া করলেও আল্লাহ তাদের মাফ করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি সে নিজেকে শুধরে না নেয়) (৯ তাওবাহঃ ৮০)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68)

মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী আর কাফিরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট। তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। তাদের তরে অন্ধকারিত আছে চিরস্থায়ী আযাব। (৯ তাওবাহঃ ৬৮)

পরিনতিঃ ১২. মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। ইরশাদ হচ্ছে...

انَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146)

মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে নিক্ষীপ্ত হবে। তাদের সাহায্য করার মত কাউকে খুঁজে পাবে না। তবে যারা তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নেবে, আল্লাহকে আঁকড়ে ধরবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিশুদ্ধ দ্বীন মেনে চলবে, তারা মুঅমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ অচিরেই মুঅমিনদেরকে দেবেন মহা পুরস্কার। (৪ সূরাহ নিসাঃ ১৪৫-১৪৬)

পরিনতিঃ ১৩. মুনাফিকরা যেহেতু আল্লাহর কিতাব ও বিধানের তথ্য গোপন করে তাই বিচার দিনে আল্লাহ তাদের প্রতি গোস্বা হবেন এবং তাদের সাথে কথা বলবেন না। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174)أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175)ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের কিছু গোপন করে অথবা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে বদলে ফেলে, তারা আগুন দিয়েই উদর পূর্তি করছে। পরকালে আল্লাহ (গুস্বা হয়ে) তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপমুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব। ওইসব লোক (আসলে) হিদায়াতের বদলে বিভ্রান্তি কিনেছে আর মাগফিরাতের বদলে আযাব। (লক্ষ্য কর) জাহান্নামের পথে তারা কত অটল! (আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত সবকিছুই অকাট্য এবং সন্দেহমুক্ত) কারণ নিশ্চয় আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন সঠিক আদর্শ দিয়ে। এতদসত্ত্বেও যারা এ কিতাবে (বর্ণিত বিষয়ে) ভিন্নমত পোষণ করবে তারা চরম বিভ্রান্ত। (২ বাক্বারাহঃ ১৭৪-১৭৬)

জ্ঞাতব্যঃ বিভ্রান্তির পথ ৭২টি। এরমধ্যে অন্যতম একটি হল আল্লাহর কিতাব বা কিতাবে বর্ণিত কোনো সুস্পষ্ট বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করা অথবা এনিয়ে দল পাকানো বা দলাদলি সৃষ্টি করা। ইতোপূর্বে আল্লাহর কিতাব নিয়ে দলাদলি করে বিভ্রান্ত হয়েছে ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টান। আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে এ উম্মতের কত মানুষ। সুতরাং যারা ইখতিলাফকে ইফতিরাক্ব তথা ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করে উম্মতের সর্বনাশ করে চলেছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি; আপনারা আল্লাহর এ হুঁশিয়ারি আমলে নিয়ে নিজেদের শুধরে নেন।

৪র্থ অনুচ্ছেদঃ দুনিয়ার জীবনে মুনাফিক ব্যক্তিকে ধন সম্পদ ও নেতৃত্ব দেয়ার কারণ

মুনাফিক যেহেতু কুফর শিরকের মত মহাপাপ করে তার ঈমানকে বিনষ্ট করে ফেলে এবং নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে নেয়। তাই তার নেক কাজের প্রতিদান আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন আর এরই ফলশ্রুতিতে তাকে অনেককিছু দান করেন। ফলে সে দুনিয়াদারী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং আরো বেশী বেশী পাপে জড়িয়ে পড়ে, যাতে তার সাজা আরো বেড়ে যায়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85)

তাদের (মুনাফিকদের) ধনবল ও জনবল যেন তোমার পেরেশানীর কারণ না হয়। দুনিয়াতে এসব দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিতে চান। যেন (এসব নিয়ে ব্যস্ত থেকে) কাফির অবস্থায়ই তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে। (৯ তাওবাহঃ ৮৫)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ঈমান, নিফাক ও ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়

মুনাফিকরা ইসলাম ও কুফর একই সাথে গ্রহণ করে, তাই তাদের জীবনের কিছু কাজ থাকে মুসলিমের মত আর কিছু কাফিরের মত। নিফাক্ব বা মুনাফিকী আসলে ইসলাম ও কুফরের মিশ্রিত রূপ। এটাও এক প্রকার কুফর এবং ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।

যে ব্যক্তি কুফর শিরক বা নিফাকে জড়িয়ে পড়ে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিক তার নামায রোজা হাজ্জ যাকার বা অন্য ইবাদাতের বিনিময়ে পরকালে কোনো ছাওয়াব পাবে না। মুনাফিকের কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়।

আসলে অযু ভঙ্গকারী, নামায ভঙ্গকারী, রোজা ভঙ্গকারী বিষয়ের মত ঈমান ভঙ্গকারীও অনেক বিষয় রয়েছে। যাকে আরবীতে বলা হয় "নাওয়াক্বীদ্বু-ল-ঈমান" তথা ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ। এসবের কোনো একটি করে ফেললে মানুষের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় আসলে ২টিঃ কুফর ও শিরক। আর কোনো মুসলিম যখন এ ২টি পাপের কোনোটিতে জড়িয়ে যায় তখন এর নাম হয় নিফাক্ব বা মুনাফিক্বী। তাই বলা যায়; ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় মোট ৩টি। যথাঃ কুফর, শিরক ও মুনাফিকী।

যে ব্যক্তি ঈমান ভঙ্গকারী কোনো কাজ করল বা ঈমান ভঙ্গকারী কথা বলল সে আর মুঅমিন থাকে না। সে হয়ে যায় ঈমানহীন মুসলিম তথা মুনাফিক। আসলে ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক।

আক্বাইদের ঈমামগণ এ সম্পর্কে অনেক কিতাব লিখেছেন। ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়ে লিখিত একটি প্রসিদ্ধ কিতাব হচ্ছেঃ "নাওয়াক্বীদ্বু-ল-ঈমান আল-ক্বাওলিয়্যাহ ওয়া-ল-ফি'লিয়্যাহ" তথা ঈমান ভঙ্গকারী কথা ও কাজ সমূহ। কুরআন হাদীছের দালাইল সম্বলিত এ কিতাবটি ৫৫০ পৃষ্টায় সমাপ্ত হয়েছে। কিতাবটি আরবী ভাষায় লিখিত।

বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আকারে আমাদের এ বইয়ের পরবর্তি অধ্যায়ে বিষয়টি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হল।

অধ্যায়ঃ ৫. ঈমান ও আমল বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

যেসব পাপ করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এগুলোকে বলা হয় "নাওয়াকিদ্বু-ল-ঈমান" (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়) নাওয়াক্বিদ্বু-ল-ঈমানের মূল বিষয় দুটিঃ কুফর ও শিরক। অর্থাৎ কোনো মুসলিম যখন নিজেকে (আধুনিক বা সনাতন) কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে ফেলে তখন তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল হয়ে যায়। তাই তার ঈমান ও আ'মালের কোনো প্রতিদানই সে আখেরাতে পাবে না।

ঈমান বিনষ্টকারী কুফর বা শিরক যেহেতু মুসলিম ব্যক্তিই করে থাকে তাই এসব কুফর শিরকের অপর নাম হয় নিফাক বা মুনাফাকী। আর যে মুসলিম এমন কোনো কাজ করে সে হয়ে যায় মুনাফিক।

ইতিমধ্যে আমরা কুফর, শিরক ও নিফাক সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বিষয়টিকে আরো সহজভাবে বোঝানোর জন্য সমাজে প্রচলিত কিছু নাওয়াক্বিদ্ব (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়) উল্লেখ করা হল।

ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম একটি পাপ হচ্ছে শিরকঃ ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম এক মহাপাপের নাম **শিরক**। অনেকের ধারনা: যারা মুর্তিপূজা করে কেবল তারাই শিরক করে আর মুসলিমরা সর্বদাই শিরক মুক্ত। বিষয়টি কিন্তু এমন নয় বরং অনেক মুসলমানও শিরকের সাথে জড়িত। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই কোনো না কোনোভাবে শিরকে জড়িয়ে পড়ে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (106)

অনেকেই আল্লাহর উপর ঈমান আনে তথাপিও তারা মুশরিক থেকে যায় /মুশরিক হয়ে যায়। (১২ ইউসুফ: ১০৬)

ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব, দলীয় বলয় ধরে রাখা অথবা অন্য কোনো কারণে মানুষ নিজেকে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে ফেলে। মুর্তিপূজা না করেও মানুষ কি ভাবে মুশরিক হয়? নিম্নের উদাহরণসমূহ থেকে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাবে।

উদাহরণঃ ১. আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরও অনেকে আল্লাহর জাতিসত্তায় শিরক করে। আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করে। যেমন ইয়াহুদ ও নাসারা। ইরশাদ হচ্ছে..

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (30)

ইয়াহুদ বলে উজাইর আল্লাহর ছেলে আর নাসারা বলে মাসীহ (ঈসা) আল্লাহর ছেলে। আসলে এসবই তাদের মুখের কথা। আগেকার কাফিররাও এমন কথা বলত। আল্লাহ ধ্বংস করুক। তারা কিসব রটনা করছে। (৯ তাওবাহ: ৩০)

পর্যালোচনাঃ উজাইর আ. মরার একশত বছর পর পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন (দেখুন সুরাহ বাকারাহ: ২৫৯) এমন আশ্চর্য ঘটনার পর ইয়াহুদ ভাবল উজাইর সাধারন মানুষ নন, তিনি অসাধারন। আর এ অসাধারনতার খিউরী প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তারা বলে ফেলল; উজাইর আল্লাহর ছেলে।

ঈসা আ. বিনা বাপে জন্ম গ্রহন করেছেন। আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবিত করতে এবং মাটির মুর্তিতে প্রাণ সঞ্চালন করতে পারতেন। আবার হাওয়ারীদের চুখের সামনেই তিনি আকাশে আরোহন করেছেন। এসব কারণে তারা ভেবেছে ঈসা সাধারন মানুষ নন। আর এ অসাধারনতার খিউরী প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলে ফেলছে; ঈসা আল্লাহর ছেলে।

আসলে এসবই নবী-রাসুল নিয়ে বাড়াবাড়ির ফসল। ইয়াহুদ ও নাসারা তাদের কাছে প্রেরিত নবীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। নিজেদের খেয়াল খুশিমত মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে নবীকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে ফেলেছে। তাইতো হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر قال :سمعتُ رسول الله ﷺ يقول **:ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةَ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم** .رواه البخاري ومسلم.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমি যেসব বিষয়ে নিষেধ করি তোমরা এসব থেকে বিরত থাকবে আর যা করতে বলি যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা করবে। (অধিক প্রশ্ন করবে না অথবা কোনোকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না) কারণঃ অধিক প্রশ্ন এবং নবীদের নিয়ে (বাড়াবাড়ির ফলে সৃষ্ট) মতবিরোধের কারণে তোমাদের পুর্ববর্তিরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

পর্যালোচনাঃ কিন্তু দুঃখের বিষয় নবী সা.র সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা স্বত্বেও আজকাল অনেক মুসলমানই ওই নিষিদ্ধ পথেই এগুচ্ছে। তারা নবী সা.কে নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করছে। নিজেদের খেয়াল খুশিমত মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে নবীকে আল্লাহর সমমানে আসীন করে ফেলছে। ধীরে ধীরে তারা যেন একত্ববাদের বদলে দ্বিত্ববাদের দিকে ঝুকে পড়ছে। তাই যেখানে আল্লাহর নাম সেখানেই মুহাম্মাদ সা.র নাম যুক্ত করা হচ্ছে। কোথাও **"ইয়া আল্লাহ্"!** লিখলে পাশেই লিখা হচ্ছে **"ইয়া মুহাম্মাদ"!** এভাবেই তারা ধীরে ধীরে দ্বিত্ববাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইয়াহুদ নাসারাদের মত আল্লাহর ছেলে না বললেও তারা বলছেঃ মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর নূরেরই অংশ। মানে আল্লাহ থেকেই মুহাম্মাদ, আল্লাহ ও মুহাম্মাদের মূলউৎস একই। এর অর্থ দাড়ায় মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর অংশ। যা ইয়াহুদ নাসারাদের ছেলে তত্বের চেয়ে আরো জঘন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ইয়া আল্লাহ্ ও ইয়া মুহাম্মাদ বলার বিধান

বিধানঃ ১. মুহাম্মাদ সা.কে খোদা মনে করে "ইয়া মুহাম্মদ" বললে শিরক হবে।
বিধানঃ ২. মুহাম্মাদ সা.কে খোদার অংশ বা সমমানের মনে করে বললেও শিরক হবে।
বিধানঃ ৩. মুহাম্মাদ সা. হাজির নাযির, তিনি সব জানেন, সব দেখেন। এমন মনে করে ইয়া মুহাম্মাদ লিখলে বা বললে শিরক হবে।
বিধানঃ ৪. মুহাম্মাদ সা. আমাদের কথা শোনে আমাদের প্রয়োজন মিটাবেন; এমন মনে করে বললেও শিরক হবে।
বিধানঃ ৫. মুহাম্মাদ সা.কে বিশেষ মর্যাদা দিতে গিয়ে এমন করলেও শিরক হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।
বিধানঃ ৬. এসব উদ্দেশ্য না থাকলে শুধু সুন্দর্যের জন্য বা এমনি এমনি "ইয়া মুহাম্মদ" লিখলে বা বললে শিরক হবে না তবে একে ধর্মীয় রূপ দিলে শিরকের দিকে ধাবিত করবে।

উদাহরণঃ ২. আমাদের সমাজের একদল লোক আল্লাহর বৈশিষ্টে অন্যকে শরীক করে নেয়। তারা মনে করে নবী হাজির নাযির তথা সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা। মুহাম্মাদ সা. আলিমু-ল-গাইব তথা অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী। আসলে হাজির নাযির, আলিমু-ল-গাইব, ইত্যাদি একান্তই আল্লাহর বৈশিষ্ট। পবিত্র কুরআনে পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছেঃ কেউ গাইব জানে না আল্লাহ ছাড়া। ইরশাদ হচ্ছে..

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65)

বলে দাও! আসমান ও যমীনে যারা আছে তাদের কেউই গাইব জানে না এক আল্লাহ ছাড়া। কেউই অনুভব করতে পারবে না; কখন হবে পুনরুত্থান। (২৭ নামল: ৬৫)

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

বলঃ আমি (নবী মুহাম্মাদ) আমার নিজের উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারি না আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। আমি যদি গাইব জানতাম তবে অধিক হারে লাভবান হতাম। কোনো মন্দই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি মুঅমিনদের তরে সু-সংবাদদাতা ও (অবাধ্যদের তরে) সাবধানকারী বৈ কিছুই নই। (৭ আ'রাফ: ১৮৮)

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্টে অন্যকে বিশেষিত করা বা অন্যকে এমন বৈশিষ্টের অধিকারী মনে করা শিরক। এমন পাপ করলে মানুষের ঈমান, ইবাদাত সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

উদাহরণঃ ৩. আমাদের সমাজের অনেকেই আল্লাহর প্রভুত্বে শিরক করে থাকেন। তারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের মনগড়া বিধান মেনে চলেন। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অন্নদাতা, রিজকদাতা, আশ্রয়দাতা, সুরক্ষাদাতা, বিধানদাতা, নিরাময়দাতা (ইত্যাদি প্রভুত্বের বৈশিষ্টের অধিকারী) মনে করেন। এমন মনে করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বে শিরক হয়, যা ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম মহাপাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের আহবার ও রুহবানকে তথা উলামা ও পীরকে রাব্ব (বিধানদাতা) বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসীহ বিন মারইয়ামকেও তথা নবীকেও (রাব্বের আসনে বসিয়েছে) অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল এক ইলাহ মেনে নিয়ে শুধুই তার ইবাদাত করতে, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (৯ তাওবাহ: ৩১)

পর্যালোচনাঃ আহলে কিতাবের যারা ঈমান এনেছিলেন আয়াতটি নাযিলের পর তারা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাতো উনাদের ইবাদাত করিনি। রাসুল সা. বললেন তাদের বর্নিত বিধান আল্লাহর বিধানের বিপরিত হলেও তোমরা মেনে নিতে। (দেখুন তাফসীর কুরতুবী)

আজকাল অহরহ এমনটি করা হচ্ছে। মানুষের মনগড়া বিধান ও নীতিমালা কুরআন সুন্নাহর বিপরিত হলেও লোকজন মেনে নিচ্ছে। ইমাম, দলীয় উলামা, পীর ও নেতা মানতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের কথা ও নীতি লংঘিত হচ্ছে। আর এভাবেই মানুষকে বিধানদাতার আসনে বসিয়ে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করে যাচ্ছে। ফলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

উদাহরণঃ ৪. ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি শিরক হল আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করা বা অন্যকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। আসলে শুধু আল্লাহর মালিকানাই সার্বভৌম এবং শুধু আল্লাহর ক্ষমতাই নিরঙ্কুশ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মালিকানা সার্বভৌম নয়, অন্য কারো ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়।

উল্লেখ্য মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- পক্ষান্তরে যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, ইহা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বভৌম।

আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো মালিকানা সার্বভৌম নয়, কারো ক্ষমতাও নিরঙ্কুশ নয়। সবাই নিজ নিজ মালিকানা ও ক্ষমতা প্রয়োগে রাষ্ট্র, সমাজ, বিবেক এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ (6)

আসমানে যা আছে, যমীনে যা আছে, আসমান যমিনের মধ্যে যা আছে এবং পাতালপুরীতে যা আছে সবকিছুর সার্বিক মালিকান একমাত্র আল্লাহর (২০ ত্বাহাঃ ৬)

আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন/করতে পারেন। (৮৫ বুরুজঃ ১৬)	فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ

তাকে (আল্লাহকে) কোনো কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয় না। কিন্তু তাদেরকে (আল্লাহ্ ছাড়া বাকি সবাইকে নিজ নিজ কাজের জন্য) জবাবদিহি করতে হয়। (২১ আনবিয়াঃ ২৩)	لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

উদাহরণঃ ৫. আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করা শিরক। যেমন..
নামাযঃ নামাযে আমরা আল্লাহর সামনে বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে /বসে থাকি, বিশেষ কিছু পাঠ করি, মাথা নত করি, সিজদাহ করি। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমনকিছু করলে শিরক হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

নিশ্চয় সকল ইবাদাতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তাই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। (৭২ জিন্নঃ ১৮)	وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

যাকাত ও সাদাকাতঃ আমরা উৎপাদিত ফসল, উপার্জিত সম্পদ, পশুপাখি আল্লাহর রাহে দান করি, আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করি। সুতরাং আল্লাহর ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করলে শিরক হবে। বর্নিত হচ্ছে..

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ﷺ قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب .قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله؛ فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه؛ فدخل الجنة رواه أحمد.

তারিক বিন শিহাব থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ একটিমাত্র মাছির কারণে একব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে এবং একটিমাত্র মাছির কারণে একব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। লোকজন বললঃ কী ভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ!? তিনি বললেনঃ এক জনপদে একটি মূর্তি ছিল। (এলাকাবাসী মূর্তিটিকে পূজা করত। মূর্তিটি তারা রাস্তার ধারে স্থাপন করেছিল।) মূর্তির জন্য কিছু উৎসর্গ না করে কেউ তা অতিক্রম করতে পারত না। একদা দুইজন (মুসলিম) ব্যক্তি এটা অতিক্রম করছিল। একালাবাসী ১ম জনকে বললঃ মূর্তির জন্য কিছু উৎসর্গ করে যাও। লোকটি বললঃ উৎসর্গ করার মত আমার কাছে কিছুই নেই। লোকজন বললঃ একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। লোকটি একটি মাছি উৎসর্গ করল। লোকজন তার পথ ছেড়ে দিল। (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য মাছি উৎসর্গ করার কারণে লোকটি মুশরিক হয়ে গেল) সে জাহান্নামী হয়ে গেল। তারপর ২য় ব্যক্তিকে বললঃ কিছু উৎসর্গ কর। সে বললঃ আমি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কোনোকিছু উৎসর্গ করি না। (লোকজন ক্ষেপে উঠল। তারা একে খোদার অবমাননা আখ্যায়িত করে) লোকটির গর্দার কেটে ফেলল। (এভাবে শহীদ হয়ে) সে জান্নাতে চলে গেল।
সূত্রঃ আহমদ। শব্দগত সামান্য পরিবর্তণসহ সালমান ফার্সি রাঃ থেকে হাদীছটি অন্য ভাবেও বর্নিত হয়েছে এবং বর্ননাটি সাহীহ। অর্থ প্রায় সমানই, তাই পুনরায় লিখা হল না। তবে সাহীহ সনদ সহ আরবী ইবারাত নীচে দেয়া হল..

هذا الأثر إنما يصح من قول سلمان كما رواه الإمام أحمد في "الزهد" (84) قال حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ. قَالُوا وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ! قَالَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ فَقَالُوا لَهُ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا! فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ. قَالَ فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوا لِلْآخَرِ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا! قَالَ مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَضَرَبُوا عُنُقَهُ قَالَ: فَدَخَلَ الْجَنَّةَ.
وصححه الألباني موقوفا على سلمان رضي الله عنه كما في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (12 / 722)؛ حيث قال: " وبالجملة؛ فالحديث صحيح موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه " انتهى

উপরের হাদীছ এবং নীচের হাদীছ একই হাদীছ। উপরের বর্ননায় বলা হয়েছে “রাসূল সা. বলেছেন” আর নীচের বর্ননায় বলা হয়েছে “সালমান ফার্সি রা. বলেছেন” হাদীছের ভাষ্য এবং অর্থ প্রায় সমান। তবে সনদ ভিন্ন হবার কারনে উপরের সনদটি দ্বাইফ এবং নীচের সনদটি সাহীহ।

রোজাঃ আমরা আল্লাহর জন্য সাওম সাধন করি তথা রোজা রাখি এবং রোজা রাখতে গিয়ে নির্ধারিত সময়ের জন্য খাদ্য, পানীয়, যৌন সম্ভোগ বর্জন করে থাকি। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমনভাবে কিছু বর্জন করা শিরক হিসেবে গন্য হবে।

হাজ্জঃ আমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ করি এবং হাজ্জ করতে গিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ (নির্ধারিত নিয়মে প্রদক্ষিণ) করি, স্বাফা মারওয়া সায়ী' (নির্ধারিত পদ্ধতিতে গমন) করি, নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে আরাফাত, মুজদালিফা ও মিনায় অবস্থান করি। উচ্চস্বরে (নির্ধারিত) তালবিয়্যাহ পাঠ করি। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করা শিরক হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71)قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72)أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ (74)قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75)أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77)الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79)وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82)

(হে নবী!) তাদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা কর, যখন সে পিতাকে এবং সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কিসের ইবাদাত কর? তারা বললঃ আমরা প্রতিমা পূজা করি (নির্ধারিত দিনে) এর কাছে অবস্থান করি। (নির্ধারিত দিনে কোনো মূর্তি, প্রতিমা, স্থান বা স্থাপনার কাছে হাজির হয়ে এটাকে সম্মান জানানো ইবাদাতের শামিল। এমন করা শিরক)

ইবরাহীম বললঃ তোমরা ডাকলে এরা কি শোনে? অথবা তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? তারা বললঃ পূর্ববর্তিদের এমন করতে দেখেছি (যুগযুগ ধরে চলে আসা জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসাবে আমরাও করছি)

ইবরাহীম বললঃ তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তিরা যাদের ইবাদাত করছ এদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? এরা (কত অলিক ও অক্ষম। এ অলিক খোদারা) আমার শত্রু, শুধু রাব্বু-ল-আ'লামীন ছাড়া। তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, হেদায়াত করেছেন। তিনি আমাকে খাদ্য দান করেন, পানীয় দান করেন। আমি অসুখ হলে তিনিই আরোগ্য করেন (একমাত্র আল্লাহই আরোগ্য দাতা, ঔষধ বা ডাক্তার আরোগ্যের মাধ্যম হতে পারে, আরোগ্য দাতা নয়) তিনিই আমাকে মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। আমি আশা করি বিচার দিনে আমার পাপ সমূহও তিনি মাফ করে দেবেন। (২৬ শুয়া'রাঃ ৬৯-৮২)

পর্যালোচনাঃ আমরা আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন করলে যেমন শিরক হয়, তেমনি ভাবে অন্য লোকেরা তাদের দেবতার জন্য যা করে (ইহা যদি ইসলামে নিষিদ্ধ হয় তবে) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করলেও শিরক হবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করাও ইবাদাতের অংশ। তাই আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত কোনো স্থান, স্থাপনা বা অন্যকিছুকে কেন্দ্র করে এমন করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম আরো একটি পাপ হচ্ছে কুফরঃ শিরকের পর ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম মহাপাপ হল কুফর। কোনো মুসলিম যে কোনোভাবে (সনাতন বা আধুনিক যে কোনো প্রকার) কুফরে জড়িয়ে পড়লে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে (কুফর অধ্যায়ে) আমরা জেনেছিঃ কুফর দুই প্রকারঃ ইসলাম পরিপন্থী কুফর আর ঈমান পরিপন্থী কুফর।

যারা মুসলিম নয়, যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি; তারা কাফির। তাদের এ কুফর সুস্পষ্ট কুফর তথা ইসলাম পরিপন্থী কুফর। এমন কুফর করলে মানুষকে কাফির বলা হয়। সমাজে তারা কাফির (অমুসলিম) হিসেবেই পরিচিত। তারা যেহেতু ঈমান আনেনি। তাই তাদের ঈমান নষ্ট হবার প্রশ্নই আসে না।

পক্ষান্তরে যারা মুসলিম, যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছে, মুসলিম হয়েও যারা কুফর করে, যারা বলেঃ তারা দ্বীন মানে, কুরআন মানে, ইসলাম মানে, আবার কুফরও করে; তাদের এ কুফর ঈমান পরিপন্থী কুফর।

এমন কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যেহেতু এরা বাহ্যত মুসলিম তাই ইসলামী পরিভাষায় এদের কাফির না বলে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিক মানব সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির।

বর্তমান বিশ্বের সাধারণ গতি ও সমাজের স্রোত কুফর শিরকের দিকে ধাবমান। তাই কালের স্রোতে গা ভাসাতে গিয়ে অনেক মুসলমানই কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়ে। নিম্নের উদাহরণসমূহ থেকে বিষয়টি আরো সহজে বোঝা যাবে, ইন শা-আল্লাহ।

উদাহরণঃ ১. নাস্তিক্যবাদঃ ঈমান বিনষ্টকারী কুফরসমূহের অন্যতম একটি হল নাস্তিক্যবাদ বা প্রকৃতিবাদ। যারা এ মতবাদে বিশ্বাস রাখে তাদেরকে বলা হয় নাস্তিক বা প্রকৃতিবাদী। নাস্তিকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের নাম সমাজতন্ত্র। নাস্তিকরা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করে না। তারা মনে করেঃ প্রকৃতিই মহান স্রষ্টা অর্থাৎ সবকিছু সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক ভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মে। তাই নাস্তিকরা নিজেদেরকে প্রকৃতিবাদী হিসেবে প্রকাশ করে। নাস্তিকদের মূল বিশ্বাস ও দর্শনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে.. তারা মনে করে..

- এ মহাবিশ্বের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। সব সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক ভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মে।
- তাদের বিশ্বাস প্রকৃতিই সবকিছুর স্রষ্টা, প্রকৃতিই মহাক্ষমতাধর।
- তারা মনে করেঃ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী, সবই প্রকৃতির সৃষ্টি।
- তাদের ধারনাঃ জীবন, মরণ, সুস্থতা, অসুস্থতা, খাদ্য, পানীয়, সবই প্রকৃতির দান।

➢ তারা মনে করেঃ জোয়ার, ভাটা, ঝড়, তোফান, জলোচ্ছ্বাস, সোনামী, ভূমিকম্প, এসব প্রকৃতির খেলা।

আসলে নাস্তিক্যবাদী চিন্তা ও ধারনা অনেক পুরাতন। আদিম যুগেও কিছু মানুষ এমন ধারনা পোষণ করত। প্রকৃতিকে আরবিতে বলা হয় "দাহর" এবং প্রকৃতিবাদকে বলা হয় "দাহরিয়্যাহ"। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে "দাহর" ও "দাহরিয়্যাহ" সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে। যেমনঃ ইরশাদ হচ্ছে..

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23)

পটভূমিঃ মানুষ বাস্তব জীবনে যার প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলে তিনিই খোদা। আসলে আল্লাহই একমাত্র খোদা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা শুধু এক আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলব। কিন্তু অনেক মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলে। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

তাকে দেখেছঃ যে ব্যক্তি "হাওয়াকে" (মনগড়া নীতি /মানবরচিত বিধান /নিজের বা অন্যের মন মানসিকতাকে) খোদা বানিয়ে নিয়েছে। (যে এমন করে) আল্লাহ জ্ঞাতসারেই তাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কানে ও মনে মোহর লাগিয়ে দেন, চুখে এটে দেন পর্দা (সে হয়ে যায় চরম বিভ্রান্ত।) কে তাকে হেদায়াত করবে আল্লাহ ছাড়া? (একথা স্পষ্টভাবে জানা সত্বেও) তোমরা কি (আল্লাহর বিধান) মেনে নেবে না? (৪৫ জাছিয়াহঃ ২৩)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কারো মনগড়া বিধান মেনে নেওয়া চরম বিভ্রান্তি, ঈমান বিনষ্টকারী কুফর।

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24)

তারা বলেঃ দুনিয়ার এ জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা জীবিত হই, মরে যাই (এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম) প্রকৃতিই আমাদের সমাপ্তি ঘটায়। (আল্লাহ্ বলছেন) আসলে এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই, তারা শুধু ধারণা করে থাকে। (৪৫ জাছিয়াহঃ ২৪)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ(94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95)

আমি যে জনপদে রাসূল পাঠাই (তারা অবাধ্য হলে প্রথমে) সেখানে দুঃখকষ্টের আযাব দেই, যেন তারা (ফিরে আসে এবং ক্ষমার জন্য) মিনতি করে, পরে (ফিরে না এলে) তাদের দুঃখকষ্টকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বদলে দেই। এতে বিভোর হয়ে তারা বলেঃ আমাদের বাপ-দাদার সময়েও এমন দুঃখকষ্ট এসেছে (এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়) তখন হঠাৎ পাকড়াও করি, কিন্তু তারা এসব বোঝতে পারে না। (৭ আ'রাফঃ ৯৪-৯৫)

উদাহরণঃ ২. শারীয়া'হ আইন না মানাঃ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয় কিন্তু ইসলামী আদর্শ, শারীয়া'হ আইন এবং আল-কুরআনের বিধান পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয় না। আসলে ইসলামী আদর্শ /শারীয়া'হ আইন অথবা কুরআনের কোনো বিধান অমান্য করা বা অবজ্ঞা করা কুফর। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (26)

তারা তোমাকে অবজ্ঞা করলে (দুঃখ কর না। কারণ) এদের পূর্বসূরিরাও (তাদের নবীকে) অবজ্ঞা করেছে। অথচ রাসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমান, লিখিত (বিধান) ও আলোকিত কিতাব নিয়ে। পরে (রাসূলকে না মানার কারণে) কাফিরদের পাকড়াও করেছি। (খোঁজ নিয়ে দেখ) না মানার পরিণতি কেমন ছিল। (৩৫ ফাতিরঃ ২৫-২৬)

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)

তারা (মুসলিমরা) বলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের আনুগত্য করি, তথাপিও কিছু মানুষ অন্য পথে ফিরে যায়। আসলে এরা মুঅমিন নয়। (কারণ) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর (কোনো আয়াত বা হাদীছে) ব্যক্তিগত ফায়দা হলে অনুগত হয়ে ছুটে আসে। (এরা কেন এমন করছে?) তবেকি এদের অন্তর রোগাক্রান্ত? নাকি এরা সন্দিহান, নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে এরাই অবিচারী (এরা অবিচার করে আল্লাহর বিধানের উপর। যা কোনো মুঅমিন করতে পারে না) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (শারীয়া'হ আইনের) প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅমিনদের কথা হবে একটাইঃ "শোনলাম আর মেনে নিলাম"। যারা এমন করে তারাই সফল। (২৪ নূরঃ ৪৭-৫১)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় এবং নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয় এবং মেনে চলতে হয়, এর বিপরীতে কোনোকিছু মেনে নেওয়া বা মেনে চলা যায় না। জীবনের কিছু বিষয়ে অন্যকিছু মেনে নিলে কুফর হয় আর ওই ব্যক্তি হয়ে যায় মুনাফিক। আর জীবনের কিছু ব্যাপারে ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু মেনে চললে পাপ হয়, ওই ব্যক্তি তখন ফাসিক হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল আমাদের

সমাজের অনেক মানুষই কিছু ইবাদাতের বেলায় ইসলাম মেনে নিলেও বিচার, শাসন, সামাজিক, রাজনৈতিক, ইত্যাদি অনেক ব্যাপারেই মানবরচিত ও মনগড়া দর্শন ও মতবাদকে নীতিগতভাবে মেনে নেয় ও মেনে চলে। উক্ত আয়াতে এদের কথাই বলা হয়েছে। এরা আসলে মুঅমিন নয়, মুনাফিক।

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)

...তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না? তোমাদের যারা এমন করবে তাদের পরিণতি হল দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। আল্লাহ বে-খবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (২ বাক্বারাহঃ ৮৫)

উদাহরণঃ ৩. মানবরচিত মতবাদঃ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা নিজেকে মুসলিম মনে করে আবার বাস্তব জীবনের অনেক বিষয়ে মানবরচিত দর্শ, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধান নিয়েছে এবং মেনে চলছে। তারা এসব মেনে নিয়েছে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কার, সংস্কৃতি, ইত্যাদি নানা নামে। কেউ কেউ আবার ধর্মের নামে অতি বাড়াবাড়ি করে দলীয় উলামা ও পীরদের বাতানো মনগড়া পথ ও আক্বীদাহ বানিয়ে উম্মতের মাঝে বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি সৃষ্টি করে আল্লাহ্ রাসূলের নির্ধারিত নীতিমালা ও বিধিবিধানের বাইরে গিয়ে কুফরে জড়িয়ে পড়েছে।

আসলে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে যত দর্শ, আদর্শ, বিধিবিধান, মতবাদ, নীতিমালা বা তরীকা রয়েছে এসবই মনগড়া, মানব রচিত এবং আল্লাহর নীতির বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নেয়া কুফর। কেউ এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল হয়ে যায়। আর ওই ব্যক্তি হয়ে যায় মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36)

আসলে তাদের অধিকাংশই "যান্ন" (ধারণা, খেয়ালখুশী, মনগড়া, মানবরচিত নীতি আদর্শ ও বিধিবিধান) এর অনুকরণ করছে। আর "যান্ন" কখনো সত্যের বিকল্প হতে পারে না। তারা যা করছে এ সব ব্যাপারে আল্লাহ অবগত। (১০ ইউনুসঃ ৩৬)

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50)

(হে নবী!) তারা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয় তবে মনে করবেঃ তারা "হাওয়া" মেনে চলছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নীতি বাদ দিয়ে "হাওয়া" (মনগড়া নীতি, আদর্শ, মতবাদ, বিধান) মেনে চলে তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না। (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে) (২৮ ক্বিস্বাস্বঃ ৫০)

হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া, মানব রচিত, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে, যতকিছু আছে এসবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"। মানুষ নানা ভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন..

- অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে। এসবই হাওয়ার অনুকরণ।
- অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া মসলক, মিনহাজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। বিভক্তি বা বিভাজনের পর্যায়ে চলে গেলে এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ হিসেবেই গন্য হবে।
- অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- এভাবে নানা জনে নানা পদ্ধতিতে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। (হাওয়া সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ নিসাঃ ১৩৫, আ'রাফঃ ১৭৬, জাছিয়াহঃ ২৩)

উদাহরণঃ ৪. আত্মসমর্পণ না করাঃ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা নিজেকে মুসলিম মনে করেন কিন্তু আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে না। অথচ আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ না করলে কেউ মুঅমিন হতে পারবে না বরং মুনাফিক হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(14)

বেদুইনরা বলেঃ "আমরা ঈমান এনেছি" বলঃ "তোমরা ঈমান আননি" বরং বলঃ "ইসলাম গ্রহণ করেছি" কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর (সঠিকভাবে ঈমান আন) তবে আল্লাহ্ তোমাদের আ'মাল নিস্ফল করবেন ন। (অন্যথায় সব বরবাদ হয়ে যাবে।) নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৪৯ হুজরাতঃ ১৪)

رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. وقال الترمذي حسن غريب

ইবন উমর রা. বলেনঃ একদা রাসূল সা. মিম্বরে আরোহণ করে উচ্চস্বরে বললেনঃ হে লোকেরা! যারা শুধু মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ, অন্তরে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি। (শোনো!) তোমরা মুসলিমদের কষ্ট দিও না, তাদের অপদস্থ কর না, তাদের দোষ অন্বেষন কর না। কারণ যেব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের দোষ অন্বেষন করে আল্লাহ্ তার দোষ অন্বেষন করবেন। আর আল্লাহর কারো দোষ অন্বেষন করলে তাকে অবশ্যই অপদস্থ হতে হয়, যদিও সে ঘরে বসে থাকে। (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীছটি হাসান গারীব)

আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ না করে কেউ মুঅমিন হতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)

না, তোমার প্রভুর কসম! তারা মুঅমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের যাবতীয় বিষিয়ে "তাহকীম" (আদেশ জারি, আইন প্রনয়ন, বিচার, শাসন, ইত্যাদি) এর জন্য তোমার কাছে আসবে, তোমার ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে এবং সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করবে। (নিসাঃ ৬৫)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়ঃ মুঅমিন হতে হলে..

- জীবনের সকল বিষয়ে আইন, বিচার, শাসন, ইত্যাদি আল্লাহর বিধান মত করতে হবে,
- আল্লাহর বিধান বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে
- আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্ন রূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই তিন শর্তের কোনো একটি পুরন না করলে মুঅমিন হওয়া যাবে না।

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

যে বা যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত "হুকম" (বিচার, শাসন, আইন, আদেশ) করে না তারা কাফির। (মাইদাহঃ ৪৪)

তাহকীম ও হুকম পরিচিতিঃ তাহকীম অর্থ হুকুম করা আর হুকম অর্থ আদেশ জারি করা, বিচার করা, শাসন করা, নীতি নির্ধারণ করা, ইত্যাদি। আসলে এসবকিছুই আসল মালিক একমাত্র আল্লাহ। আমরা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে এসব করতে পারব তবে এসব করতে হবে আল্লাহর দেওয়া নীতিমালা মেনে, আল্লাহর বিধানের আওতাধীন থেকে, নতুবা এসব কাজ কুফর হয়ে যাবে এবং এসব মেনে নেওয়া হবে শিরক।

উদাহরণঃ ৫. সংশয়ঃ আমাদের সমাজের অনেক মানুষ নিজেকে মুসলিম মনে করে কিন্তু কুরআনে বর্নিত কিছু তথ্য বা বিধানের ব্যাপারে সংশয়ে ভোগে। অথচ কুরআনের আয়াত বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত কোনো বিষয়ে সন্দেহ করা বা সংশয়ে থাকা কুফর। এমন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। সকল রাসূলের সকল শারীয়া'হ মতেই এ বিধান কার্যকর ছিল। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9)

নূহের জাতি, আ'দ, ছামূদ এবং পরবর্তি জাতিসমূহের সংবাদ তোমাদের কাছে পৌছায়নি? যারা অতীত হয়ে গেছে, আল্লাহ এদের ব্যাপারে অবগত। রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমান নিয়ে এসেছিলেন। (তথাপিও তারা বিরোধিতা করেছে) তারা গুস্বায় দাঁত কামড়িয়ে বলেছেঃ তোমাদের আনিত বিধান আমরা প্রত্যাখ্যান করি, তোমরা যে পথে ডাকছ এ ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান। (১৪ ইবরাহীমঃ ৯) এ আয়াতটি কাফিরদের ব্যাপারে হলেও পরবর্তী আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45)

যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তারা নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ (করবে এটাই স্বাভাবিক। তারা কখনো জিহাদ) থেকে (অব্যাহতির) অনুমতি চাইতে পারে না। আল্লাহ মুত্তাক্বীদের ব্যাপারে খুবই অবগত। (উল্লেখ্য যে বা যারা আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও কবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থাকে তাদেরকে মুত্তাক্বী বলা হয়) (জিহাদ থেকে অব্যাহতির) অনুমতি কেবল তারাই চাইবে যারা (প্রকৃত পক্ষে) আল্লাহ ও আখেরাতের ঈমান রাখে না। তাদের অন্তরে আছে সংশয় এবং তারা সংশয়ে ঘূর্ণায়মান। (৯ তাওবাহঃ ৪৪-৪৫) জিহাদ থেকে দূরে থাকার জন্য বাহানা বানানো মুনাফিকী। এমন করলে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারেরই প্রতিরক্ষা নীতি বা যুদ্ধ নীতি থাকে। প্রতিরক্ষা নীতি ছাড়া কোনো দেশ বা জাতি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়। দেশ জাতি ও সরকার গঠন এবং পরিচালনা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলাম তার জাতির জন্য যে প্রতিরক্ষা নীতি ঠিক করে দিয়েছে ইহার নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। দেশ জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন। এটাকেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলা হয়।

উদাহরণঃ ৬. ঠাট্টা-মশকারাঃ আল্লাহ্ আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর বিধান ও মুঅমিনদের নিয়েও ঠাট্টা মশকারা করে। আসলে এমন করা কুফর। ইরশাদ হচ্ছে.

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)

(তারা আল্লাহ, রাসূল ও মুঅমিনদের সম্পর্কে কটু কথা বলে আর) জিজ্ঞেস করলে বলে ঠাট্টা করেছি। বলঃ তোমরা আল্লাহ, আল্লাহর বিধান ও রাসূল নিয়েও ঠাট্টা কর? বাহানা বানিও না। তোমরা ঈমানের পর কুফর করেছ। তোমাদের কাউকে (যে তাওবাহ করবে তাকে) মাফ করা হলেও অন্যদেরকে অবশ্যই সাজা দেয়া হবে। কারণ তারা পাপিষ্ঠ। (তাওবাহঃ ৬৫-৬৬)

উদাহরণঃ ৭. মুঅমিনদের বিপক্ষে অবস্থানঃ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা নিজেকে মুসলিম মনে করে অথচ সামাজিক, রাজনৈতিকসহ অনেক বিষয়ে মুঅমিনদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ইসলামের শত্রুদের সমর্থন করে। আসলে এমন করাও কুফর। যারা এমন করে তারা মুনাফিক হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)

মুঅমিনরা যেন মুঅমিন ছাড়া কোনো কাফিরকে ওয়ালী (অভিভাবক, মিত্র) বানায়। যে কেউ এমন করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে প্রতিরক্ষা হিসেবে তাক্বিয়্যাহ করতে পারবে। (আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে তাক্বিয়্যাহ বলে) আল্লাহ তাঁর (আযাবের) ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন। আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২৮)

উদাহরণঃ ৮. হালাল-হারাম নির্ধারণঃ ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি পাপ হচ্ছে নিজেদের মত করে হালাল-হারাম নির্ধারণ করা, আমাদের সমাজের অনেকেই যেমনটি করে থাকেন।

ইসলামী বিধানে কর্ম সম্পাদন সাধারণত দুই ধরনের হয়ঃ ঐচ্ছিক এবং আবশ্যকীয়। ইসলামী বিধানে আবশ্যকীয় করনীয়কে বলা হয় "ফারদ্ব" (ফরজ) আর আবশ্যকীয় বর্জনীয়কে বলা হয় হারাম।

যেসব বিষয় "দালীল ক্বাত্বয়ী" (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ) দ্বারা প্রমানিত এবং এটি ফরজ বা হারাম হতে অন্য কোনো প্রতিবন্ধকও নেই; ফিক্বহী বিন্যাসে একে ফারদ্ব (ফরজ) বা হারাম বলা হয়। আর যেসব বিষয় তোলনামূলক দুর্বল দলীল (যথাঃ আল-কুরআনের ইঙ্গিত পূর্ন আয়াত, মুতাওয়াতির ছাড়া সাধারন সাহীহ হাদীছ বা ইজমা অথবা কিয়াস) দ্বারা প্রমানিত এসব কাজ ফরজ বা হারাম হয় না বরং সুন্নত, মুস্তাহাব বা মাকরুহ হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিষয় নিয়ে ইমামগণের মাঝে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়।

পর্যালোচনাঃ যেসব বিষয় "দালীল ক্বাত্বয়ী" দ্বারা প্রমানিত নয় বরং তোলনা মূলক দুর্বল দলীল দ্বারা প্রমানিত প্রাথমিক যুগের ফাক্বীহগণ সাধারণত এসব বিষয়কে সরাসরি ফরজ বলতেন না বা হারাম বলতেন না। উনাদের সাধারন পরিভাষা ছিলঃ

- এমন করা উত্তম,
- এমন না করা উচিত,
- এমন করলে সমস্যা নেই,
- এমন করা যেতে পারে,
- এমন করা বৈধ নয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এসব কথাকে বলা হত ফিক্বহ তথা উনাদের অনুধাবন। কারণঃ ফিক্বহী বিন্যাসে "শুধুমাত্র দালীল ক্বাত্বয়ী' দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহকে ফরজ বলা হয়"। তাই ক্বাত্বয়ী' নয় এমন দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ে উনারা সাধারণত ফরজ বা হারাম শব্দ এড়িয়ে চলতেন, যা আজো ফিক্বহ, হাদীছ ও তাফসীরের কিতাবাদিতে বিদ্যমান আছে। কারণ ফরজ বা হারাম ইসলামী শারীয়াহর কঠিনতম পরিভাষা এবং এসব নির্ধারণ করার বৈধ অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ আর আল্লাহর অনুমোদন ক্রমে রাসূল, অন্যকেউ এমন করলে অনাধিকার চর্চা হবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের অধিকারে হস্তক্ষেপ হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116)

"এটা হালাল আর এটা হারাম" তোমরা এমন কথা বলে যবান দরাজ করে মিথ্যাচার কর না। এতে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা হয়। আর আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারীরা সফল হতে পারে না। (১৬ নাহ'লঃ ১১৬)

কিন্তু বর্তমানে খুব কম লোকই দলীলের মান বিচার করে কথা বলে। কারণঃ আমাদের সমাজের প্রায় সকল আলীমই কোনো না কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত এবং উনাদের অনেকেই নিজেদের দলীয় মতাদর্শকে দ্বীন ও শারীয়া'হ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেন। আর উনাদেরই কিছু অতি উৎসাহী মানুষ এসব বিষয়াদি নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে নিজেদের খেয়াল খুশী মত ফরজ বা হারাম আখ্যা দিয়ে থাকেন। যা মোটেই কাম্য ছিল না এবং গ্রহণযোগ্যও নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ইখতিলাফ বা ভিন্ন মতঃ ইসলামী শারীয়া'হর যেসব বিধান অকাট্ট দলীল (কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছ) দ্বারা প্রমানিত এসব মেনে নেওয়া ফরজ এবং অমান্য বা অবজ্ঞা করা কুফর, এসব বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের কোনো সুযোগ নেই।

আর যেসব বিধান ইজতিহাদ দ্বারা বা অস্পষ্ট আয়াত (যার একাধিক অর্থ রয়েছে) দ্বারা বা সাধারন সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমানিত এতে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমতের সুযোগ রয়েছে।

দলীল ভিত্তিক এসব মতের প্রত্যেকটিকে নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয় যদিও মুসলিম ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে এসব মতের যে কোনো একটি বা একাধিক মত মেনে চলতে পারবে। দলীলভিত্তিক এসব মতের কোনোটিকে নীতিগতভাবে অমান্য করা বা বিভ্রান্ত বলা যাবে না। এমন করলে ভিন্নমতকে ভিন্ন পথে রূপান্তরিত করা হবে। আর ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও ভিন্ন পথ বানানো ও মেনে নেওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ।

উদাহরণঃ ৯. ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করাঃ ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি মহাপাপ হল আল্লাহ্ বা রাসূল নির্দেশিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা, যেমন্টি আমাদের অনেকেই করে থাকেন। যেমন কিছু মানুষ মনে করে "দ্বীন পালনে বাধ্যবাধকতা নেই" অর্থাৎ যার যতটুকু খুশী দ্বীন পালন করবে, যার খুশী করবে না। আসলে এমন মনে করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন মনে করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

আল্লাহ্ ও রাসূল কোনো ফয়সালা করে ফেললে মুঅমিন পুরুষ বা নারী কারো কোনো এখতিয়ার থাকে না (বরং সবাই তা মেনে নিতে বাধ্য) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হবে সে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। (৩৩ আহযাবঃ ৩৬)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট হলঃ ইসলামী বিধানকে দুইভাবে বিভক্ত করা হয়েছেঃ আবশ্যকীয় বিধান আর ঐচ্ছিক বিধান। শারীয়া'হ পরিভাষায়..

- আবশ্যকীয় করনীয় বিধানকে বলা হয় ফরজ।
- আবশ্যকীয় বর্জনীয় বিধানকে বলা হয় হারাম।
- ঐচ্ছিক করনীয় বিধানকে বলা হয় তাত্বাওয়্যু।
- ঐচ্ছিক বর্জনীয় বিধানকে বলা হয় মাকরুহ।

গুরুত্ব বিবেচনায় তাত্বাওয়্যু'কে আবার তিন ভাবে বিভক্ত করা হয়েছেঃ সুন্নত, মুস্তাহাব, নফল এবং মাকরুহকে দুই ভাবে বিভক্ত করা হয়েছেঃ মাকরুহ তানযিহী তথা সাধারন মাকরুহ আর মাকরুহ তাহরিমী তথা কঠিন মাকরুহ।

ইসলামী বিধানে ফরজ পালন করা এবং হারাম বর্জন করা অত্যাবশ্যক। এর ব্যতিক্রম করা মহাপাপ, যা করলে মানুষ ফাসিক হয়ে যায়। এজন্য দুনিয়ার বিচারেও সাজা পেতে হয় এবং আল্লাহ্ মাফ না করলে আখেরাতেও সাজা পেতে হবে। আর অকাট্ট দলীল (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ) দ্বারা প্রমানিত কোনো ফরজ বা হারামকে নীতিগত ভাবে অমান্য, অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর, যা করলে মানুষের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। মানুষ তখন মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।

একটি ভুল সংশোধনঃ আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি ভুল কথা হল "দ্বীন পালনে বাধ্যবাধকতা নেই"। কথাটি যে ভুল উপরের আলোচনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। আসলে কথাটি হবে "দ্বীন গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নেই"। যে কথাটি বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২৫৬ তম আয়াতে। ইরশাদ হচ্ছে..

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

দ্বীন গ্রহনে বাধ্যবাধকতা নেই। (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ননার দ্বারা) বিভ্রান্তি আর হেদায়াত সম্পূর্নরূপে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি সকল ত্বাগূ'তকে বর্জন করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরল যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৬)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে মুসলিম হবার পর অবশ্যই ফরজ কাজ করতে হবে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

উদাহরণঃ ১০. শারীয়া'হ বহির্ভুত বিধানঃ আমরা যে সমাজে বাস করি এটা স্যাকুলার সমাজ আর এখানকার অনেক মুসলিমই স্যাকুলার মুসলিম। স্যাকুলাররা ইসলমাকে ধর্ম হিসেবে মানে কিন্তু জীবন আদর্শ হিসেবে মানে না। তাই তারা শারীয়াহ আইন তথা ইসলামী জীবন বিধান পছন্দ করে না।

আসলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি বিষয়ে নীতিগতভাবে শারীয়া'হ আইন মেনে নেওয়া ঈমানের অংশ আর মেনে চলা ফরজ। বাস্তব জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে শারীয়া'হ বহির্ভুত কোনো আদর্শ, দর্শন, মতবাদ, বিধান বা নীতিমালা মেনে নেওয়া কুফর আর মেনে চলা মহাপাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(115)

হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যেব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে, মুঅমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরবে, সে যেদিকে ফিরে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব এবং তাকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে যা জঘন্যতম আবাস। (নিসাঃ ১১৫)

জ্ঞাতব্যঃ আজকাল অনেকেই নেতা মানা, আইন মানা, পীর মানা, আলিম মানা বা ইমাম মানার নামে রাসূল সাঃর হাদীছকে অবজ্ঞা করে থাকেন। অথচ হেদায়াতের একমাত্র পথ রাসূল সাঃর অনুকরণ। যে পথ আঁকড়ে ধরে ছিলেন সাহাবাগণ। রাসূল সাঃর অনুকরণ ছেড়ে অন্য পথে গেলে বা অন্য পথ ধরলে বিভ্রান্তি অনিবার্জ হয়ে যায়।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22)

তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে যার সামনে আমার বিধান পেশ করা হল আর সে এটা প্রত্যাখ্যান করল? আমি অবশ্যই পাপিষ্ঠদের থেকে (তাদের অবাধ্যতার) বদলা নেব। (৩২ সাজিদাহঃ ২২)

উদাহরণঃ ১১. যাদুঃ ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম আরো একটি কুফর হল যাদু। সকল প্রকার যাদুই কুফর। কোনো মুসলিম যাদু করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে আর সে হয়ে যাবে মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

পটভূমিঃ অনেক ইয়াহুদ আলিম যাদুকে বৈধ বলত। তারা মনে করতঃ জীবরাঈল ও মিকাঈল দুই ফিরিস্তা বাবিল শহরে প্রেরিত হয়ে হারুত মারুত পরিচয়ে মানুষকে যাদু শিখিয়েছেন। যে যাদু দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন সুলাইমান বিন দাউদ। তারা বিশ্বাস করত সুলাইমান যাদুগর ছিলেন। রাসূল সা. যখন বললেনঃ সুলাইমান আ. নবী ছিলেন। তখন ইয়াহুদ আলিমরা বললঃ মুহাম্মাদ মনে করে সুলাইমান নবী ছিল। দাউদের ছেলে যাদুগর বৈ কিছুই ছিল না। (কুরতুবী) এতে নাযিল হল..

সুলাইমানের রাজ্যে শয়তানরা যা (যাদুমন্ত্র) পাঠ করত তারা (ইয়াহুদ উলামা) এসব মেনে নিয়েছে। আসলে সুলাইমান কুফর (যাদু) করেনি। বরং শয়তানরাই কুফর করেছে, তারাই মানুষকে যাদু শিখিয়েছে.. (২ বাক্বারাহঃ ১০২)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ আজকাল অনেকেই যাদু ব্যবহার করেন। কেউ আনন্দ উপভোগের জন্য যাদুর খেলা করেন। অনেকে বশীকরণের জন্য যাদুর আশ্রয় নেন। এভাবে নানা জনে নানা ভাবে যাদু করে থাকেন। আর নিশ্চিত ফল পাবার আশায় অনেক আলিমকেও তাবিজের নামে যাদু ব্যবহার করতে দেখা যায়। আক্বীদাহ বিষয়ে পরিপক্ক জ্ঞানের অভাবে অনেকেই যাদু ও তাবিজের পার্থক্য বুঝেন না। তারা তাবিজ মনে করে যাদু করেন। তাই নিম্নে যাদু চিনার কিছু আলামত পেশ করা হলঃ

- যাদু আরবীসহ যে কোনো ভাষায় হতে পারে।
- যাদুর মন্ত্র সহজে বোধগম্য নয়।
- যাদু লিখতে নানা ধরনের নকশা বা নম্বর ব্যবহার করা হয়।
- যাদুর জন্য কুরআনের আয়াতকে অন্য ভাবে লিখা হয়।

- প্রতারণার জন্য মধ্যখানে কুরআনের আয়াত ও চার পাশে যাদু লিখা হয়।
- যাদুর জন্য মানুষ, জিন্ন, শয়তানসহ অনেকের নাম ব্যবহার করা হয়।
- যাদুর জন্য পশু পাখির রক্ত, চামড়া বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা হয়।
- যাদুর জন্য মানুষের নুখ, চুল বা ব্যবহৃত কাপড় ব্যবহার করা হয়।
- যাদুকৃত তাবিজ বা বস্তু মাটিতে পুতে রাখা হয় /পানিতে ফেলে দেয়া হয় /পশু পাখিকে খাবানো হয় বা গাছে বেঁধে রাখা হয়।
- আমাদের সমাজে কবিরাজ আলিমদের মাঝে " চেহেল কাফ" নামে খ্যাত যে মন্ত্র রয়েছে এটাও যাদু

বিঃ দ্রঃ আমাদের সমাজে রোগব্যাধি থেকে মুক্তি ও সুরক্ষার জন্য তাবিজ ও ঝাড়ফুঁকের রেওয়াজ রয়েছে। তাই এবিষয়ে শরীয়তের বিধান জেনে রাখা আবশ্যক। কথাটি বিবেচনায় রেখে ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ সম্পর্কে জরুরী কিছু বিধান পেশ করা হলঃ

- কোনো দেবতা, দৈত্য, দানব তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে ঝাড়ফুঁক করা শিরক। এমন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। তাই এমন ঝাড়ফুঁক করা ও করানো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।
- কারো নাম ব্যবহার না করে আজিবাজি কথা বলে যে ঝাড়ফুঁক করা হয় এসব শিরক না হলেও পরিত্যাজ্য।
- কুরআনের আয়াত বা মাসনুন দোয়া ব্যবহার করে ঝাড়ফুঁক হাদিছে প্রমাণিত, এর নাম রুক্বইয়াহ। রুক্বইয়াহ করা সুন্নত।
- অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য গাছের জড়ি, মাছের কাটা, পশুর হাড় ইত্যাদি ব্যবহার করা শারীয়া'হ অনুমোদিত নয়। এসব কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব বস্তুকে অসিলা হিসেবে ব্যবহার করা ছোটশিরক আর কার্যকরশক্তি হিসেবে ব্যবহার করা বড় শিরক।
- তাবিজ ব্যবহার ইসলামী সংস্কৃতি নয়। নবী সা. বা সাহাবাগণ তাবিজ লিখেননি বা তাবিজ ব্যবহারকে পছন্দ করেননি। তখনকার সময়ে ইয়াহুদ সমাজে তাবিজের প্রচলন ছিল। ইয়াহুদ আলিমগণ তাবিজ লিখত।
- কুরআনের আয়াত বা মাসনুন দোয়া ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তাবিজ ব্যবহার করা সাহাবী, তাবিয়ীগণের সর্বসম্মত মতে বৈধ নয়।

কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ ব্যবহার করা অনেকের মতে অবৈধ। কারন এটা ইসলামী সংস্কৃতি নয়। আর আ'ইশাহ, আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃসহ অনেকের মতে অবৈধ নয়। কারন কুরআনের আয়াত লিখে সঙ্গে রাখা অবৈধ হবার কোনো নিদৃষ্ট দলীল নাই।

উদাহরণঃ ১২. হালালকে হারাম মনে করা. ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি মহাপাপ হচ্ছে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ দ্বারা প্রমানিত কোনো হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা। অথচ পরিপক্ক জ্ঞানের অভাবে আমাদের সমাজের নেক আলীমই এমন কুফরের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন তোমরা এটাকে হারাম বানিও না, তোমরা নিজেদের সীমা লঙ্ঘন কর না। (মনে রেখো!) আল্লাহ কোনো সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (৫ মাইদাহঃ ৮৭)

বিঃ দ্রঃ= তবে যেসব বিষয় হালাল বা হারাম বলে আল-কুরআনে সরাসরি উল্লেখ হয়নি বা মোতাওয়াতির মানের কোনো হাদীছে বর্নিত হয়নি, শুধু ফিক্বহী নিয়মের আওতায় এনে বিধান জারি করা হয়েছে; এমন বিষয়ে দ্বিমত করলে ঈমানের ক্ষতি হয় না। যেমনঃ কচ্ছপ খাওয়া, কাকড়া খাওয়া, ডলফিন খাওয়া, ইত্যাদি। হানাফী মাযহাবের সূত্র মতে এগুলো খাওয়া অনুচিত হলেও অন্য ঈমানগণের মতে এতে কোন অসুবিধা নেই। যদিও কারো মতেই এসব খাওয়া হারাম নয়।

উদাহরণঃ ১৩. তিরস্কারঃ ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি কুফর হচ্ছে দ্বীনি ব্যাপারে কাউকে তিরস্কার করা বা গালি দেওয়া। যে ব্যক্তি দ্বীনি কোনো বিষয় নিয়ে কাউকে তিরস্কার করল বা গালি দিল তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে গেল। সে হয়ে গেল চির জাহান্নামী মুনাফিক। অথচ আমাদের সমাজের অনেকেই এমনটি করে থাকেন। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)

তারা চুক্তি ভঙ্গ করলে, দ্বীনি ব্যাপারে তোমাদের তিরস্কার করলে আর চুক্তি মানা হবে না। তোমরা তখন কাফির নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যেন তারা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকে। (৯ তাওবাহঃ ১২)

উদাহরণঃ ১৪. তাক্বদীর অমান্য করা. ঈমান বিনষ্টকারী কুফরসমূহের আরো একটি হল তাক্বদীর অমান্য করা। তাক্বদীর অমান্য করলে বা অস্বীকার করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমুসলিম তাক্বদীর অমান্য করবে সে মুনাফিক হয়ে যাবে এবং তার সকল আ'মাল ও ই'বাদাত বরবাদ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156)

মুঅমিনগণ! তোমরা তাদের মত হইও না, যারা কুফর করে (তথা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকে) আর তাদের যেসব ভাই অভিযানে বা যুদ্ধে (মারা) যায় তাদের সম্পর্কে বলেঃ আমাদের সঙ্গে থাকলে এভাবে মরতে হত না বা নিহত হত না। যেন আল্লাহ তাদের মনে পরিতাপ সৃষ্টি করেন। আসলে জীবন মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ। (আ-ল ই'মরানঃ ১৫৬)

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ

كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)

(অহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে) মুসীবতের পর তিনি নাযিল করেছেন প্রশান্তি ও তন্দ্রা, যা তোমাদের অনেককে আচ্ছাদিত করেছিল আর অনেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আল্লাহ সম্পর্কে ভুল ও কুফরি ধারনা পোষণ করেছিল। তারা বলছিলঃ (আমরা মদীনায় থেকে প্রতিরোধের কথা বলে ছিলাম) আমাদের কথার কি মূল্য দেয়া হয়েছে? বলঃ সকল সিদ্ধান্তের মালিক আল্লাহ। তাদের অন্তরে এমন কিছু গোপন রয়েছে যা তারা প্রকাশ করতে পারছে না। তারা (মনে মনে) বলছেঃ আমাদের কথা মানা হলে এভাবে মরতে হত না। বলঃ (তাকদীরে) **যাদের মৃত্যু নির্ধারিত ছিল তারা ঘরে বসে থাকলেও মৃত্যুর স্থানে ছুটে আসতে হত।** (আল্লাহ এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন) তোমাদের অন্তরের বিষয় পরীক্ষা করার জন্য, তোমাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য। আল্লাহ হলেন অন্তর্জামি। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৫৪)

উদাহরণঃ ১৫. কিছু মানা, কিছু না মানাঃ ঈমান বিনষ্টকারী কুফরসমূহের একটি হচ্ছে আল-কুরআনে বর্নিত বিধানসমূহের কিছু মানা আর কিছু না মানা অথবা কখনো মানা আর কখনো অমান্য করা। আমাদের সমাজের অনেক মুসলিমই আজকাল এমন হয়ে গেছেন, তারা ইসলামের কিছু মানেন আর কিছু মানেন না। ইরশাদ হচ্ছে..

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)

তথাপিও তোমরা পরস্পরে যুদ্ধ কর, একদল অন্যদলকে ঘর ছাড়া কর, পাপের পথে অন্যায়ভাবে একে অপরের বিরোদ্ধে শত্রুকে সাহায্য কর, আবার কেউ বন্দি হলে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়েও আন। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না? যারা এমন করে তাদের পরিণতি দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। আল্লাহ বেখবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (২ বাক্বারাহঃ ৮৫)

জ্ঞাতব্যঃ বানী-ইসরাঈল আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় ঐক্য ভঙ্গ করে..

- তারা দলাদলি করত, যা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল,
- তারা পরস্পরে বিবাদ করত, যা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল,
- তাদের একদল কাফিরদের এক গোত্রের সাথে এবং অন্যদল অন্য গোত্রের সাথে জোট বেঁধে লড়াই করত, এটাও নিষিদ্ধ ছিল,
- এতে করে কখনো একদল ইয়াহুদ এই পক্ষ এবং অন্যদল ওই পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করত, এটাও নিষিদ্ধ ছিল,
- যুদ্ধে প্রতি পক্ষের কোনো ইয়াহুদ বন্দি হয়ে এলে (আল্লাহর বিধান মানার জন্য) তারা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে দিত।
- এভাবে তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলত আর কোনো বিষয়ে জোটের বা মিত্রের বিধান।

উদাহরণঃ ১৬. জ্যোতিষীঃ ঈমান বিনষ্টকারী কুফর সমূহের আরো একটি হচ্ছে গণক বা জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া এবং তাদের কথা বিশ্বাস করা। অথচ আজকাল আমাদের অনেক মুসলিমই জ্যোতিষী হয়েগেছেন, আর অনেকেই জ্যোতিষীদের কাছে যান এবং তাদের কথা বিশ্বাস করেন; যা সুস্পষ্ট কুফরেরই নামান্তর। বর্নিত হচ্ছে..

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ .رواه أبو داود.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো কাহিন (গণক/জ্যোতিষী) এর কাছে গেল এবং তার কথা বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদের উপর নাযিলকৃত (দ্বীন) এর সাথে কুফর করল। (আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

উদাহরণঃ ১৭. দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়াঃ ঈমান বিনষ্টকারী কুফরসমূহের আরো একটি কুফর হচ্ছে দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া। যে ব্যক্তি দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেলে আমল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়, তখন এ আমলের বদলে আখেরাতে কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ আজকাল আমাদের অধিকাংশ মানুষই এমন হয়ে গেছেন। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (39)

আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ ও রাসূলের) অবাধ্য হল, দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিল; তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। (দ্বীনের উপর বা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া কুফর, বিভ্রান্তির অন্যতম কারন) (৭৯ নাযিয়া'তঃ ৩৭-৩৯)

উদাহরণঃ ১৮. দলাদলিঃ আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত কুফরের আরো একটি নমুনা হচ্ছে বিভক্তি ও বিভাজন তথা দলাদলি। বর্তমানে আলিম নামধারী কিছু বিভ্রান্ত মানুষ মুসলিম জাতির মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন সৃষ্টি করে উম্মতকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছেন। অথচ মুসলিম জাতির মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করা এবং যারা এমন করে তাদের অঙ্গ দেওয়া সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ। এমনকি যে বা যারা এমন করে নবী সা.-র সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় বলেও হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)

আর (শুনো!) তোমরা (দুনিয়ার সকল মুসলিম) ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর আদর্শ আঁকড়ে থাকবে, তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে না। তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, আল্লাহ (ইসলামী ভাতৃত্ববোধ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শে) তোমাদের অন্তরকে পরস্পরে মিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর দয়ায় তোমরা এখন ভাই ভাই হয়ে গেছো। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১০৩)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)

আর (হে আমার বান্দারা!) তোমরা তাদের মত হইও না! যারা পরস্পরে মতবিরোধ করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে (ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলেছে) অথচ তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল সুস্পষ্ট প্রমান (আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অতীতে যারা দলাদলি করেছে এবং তোমাদের যারা দলাদলি করবে) তাদের তরে মহা আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১০৫)

আইন ও বিধানঃ উক্ত আয়াতে তাদের সঙ্গ দিতে এবং সমর্থন করতে নিষেধ করা হয়েছে যারা পরস্পরে মতবিরোধ করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ যারা ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলেছে এবং বানিয়ে ফেলছে। তাই ইসলামী বিধান মতে বিবাদ, বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি যেমন নিষিদ্ধ ঠিন তেমনিভাবে যারা এসব জঘন্য কাজ করে তাদের সঙ্গ দেওয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ। অতীতে এমনটি

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)

(হে নবী!) যারা দ্বীনকে ভাগ করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায় তুমি তাদের কেউ নও। তাদের বিষয় আল্লাহর উপর। তিনিই দেবেন তাদের কর্মফল। (৬ আনয়া'মঃ ১৫৯)

জ্ঞাতব্যঃ যেহেতু নবী সা.র সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাই সকল দলবাজরাই বিভ্রান্ত, হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত শুধু তারাই যারা দলবাজি করবে না।

উদাহরণঃ ১৯. ত্বাগূত বর্জন না করাঃ আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত কুফরের আরো একটি নমুনা হচ্ছে ত্বাগূত বর্জন না করা। আজকাল আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছেন যারা নিজেকে মুসলিম মনে করেন, অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম মেনেও চলেন তবে ত্বাগূত বর্জন করেন না।এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61)

তাদের দেখনি? যারা মনে করেঃ তারা তোমার প্রতি এবং ইতোপূর্বে নাযিলকৃত কিতাব ও বিধানের প্রতি ঈমান এনেছে আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগূ'তের কাছে? অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল যেন ত্বাগূতকে বর্জন করে। শয়তান তাদেরকে পরিপূর্নভাবে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। যদি বলা হয় আসো! (জীবন বিধান হিসেবে) আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শ মেনে চলি। দেখবে মুনাফিকরা তোমা থেকে কেটে পড়ছে। (৪ নিসাঃ ৬০-৬১)

জ্ঞাতব্যঃ ত্বাগূ'ত এর মূল শব্দ ত্বুগ'ইয়ান অর্থ অবাধ্যতা। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও অশুভ শক্তিকে ত্বাগূ'ত বলে। সবচেয়ে বড় ত্বাগূ'ত শয়তান। বিভ্রান্তির মাধ্যম হিসেবে মূর্তিকেও ত্বাগূ'ত বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ **কুফর, শিরক ও অন্যান্য মহাপাপের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা**

আল-কুরআন আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে পাপ দুই প্রকার এবং এক প্রকার পাপের নাম কাবীরাহ। তবে কাবীরাহ বা মহাপাপের কোনো তালিকা আল-কুরআনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। কোনো একক হাদীছেও রাসূল সা. এমন তালিকা বর্ণনা করেননি। তবে একটি হাদীছে ৭টি মহাপাপের তালিকা দিয়ে এগুলোকে ধ্বংসাত্বক ৭ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর এগুলো হচ্ছে..

ধ্বংসাত্বক ৭			
	পাপ	**মন্তব্য**	**পরিনতি**
১	শিরক (ও কুফর)		কুফর আসলে শিরকেরই অংশ। আল-কুরআনের একাধিক আয়াতে শিরককে কুফর বলা হয়েছে। (দেখুন সূরাহ যুমার আয়াত ৮)
২	যাদু		যাদু আসলে কুফরেরই অংশ, যাদু করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়
৩	আল্লাহ্ যাদেরকে হত্যা করা হারাম করেছেন এমন কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা		কোনো মুসলিমকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা মহাপাপ আর এ অন্যায় হত্যাকে হালাল মনে করা কুফর।
৪	সুদ গ্রহণ		সুদ গ্রহণ করা মহাপাপ। তবে সুদকে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া কুফর।
৫	এতীমের সম্পদ ভক্ষণ		যেব্যক্তি এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করল সে আগুন দিয়ে উদর পুর্তি করল।
৬	যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে থাকা		যে ব্যক্তি যুদ্ধ থেকে পালাল সে চির জাহান্নামী। (দেখুন আনফালঃ ১৬)
৭	সতীসাধ্বী মুসলিম নারীকে তার অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে যিনার অপবাদ দেয়া		যে ব্যক্তি এমন করল সে চারজন মানসম্পন্ন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমান করতে না পারলে তাকে এর সাজা ভোগ করতে হবে।
	উল্লেখিত ৭টি পাপ ব্যতীত আর যেসব পাপকে কাবীরাহ হিসেবে হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে		
৮	কুফর		কুফর করলে ঈমান ও আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

৯	মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া		
১০	যিনা করা		
১১	চুরি করা		
১২	মদ্যপান বা মাদকাসক্তি		
১৩	ডাকাতি ও রাহাজানি		
১৪	অন্য মুঅমিনের নিন্দা (গীবত)		
১৫	পরচর্চা (নামীমাহ) ইত্যাদি		

নীচের টেবিলটিতে কুফর ও শিরক সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া হল..

পাপ	ধরণ	সংজ্ঞা	উপমা	প্রতিক্রিয়া
বড় শিরক	ইবাদাতে শিরক	আল্লাহর ইবাদাত করতে যা কিছু করা হয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করা।	নামাযে আমরা বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বা বসে বিশেষ কিছু পাঠ করি, রোজায় আমরা আল্লাহর জন্য খাদ্য পানীয় ও যৌন সম্ভোগ বর্জন করি, হাজ্জে বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে গমন ও অবস্থান করি, আমরা আল্লাহর নামে কুরবানী তথা উৎসর্গ করি, তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করলে শিরক হয়।	শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।
বড় শিরক	প্রভুত্বে শিরক	আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে বিধান দাতা হিসেবে মেনে নেয়া বা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেওয়া।	আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেওয়া, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের ফতোয়া বা আদেশ মেনে নেওয়া, আল্লাহর ছাড়া অন্যকে বিধানদাতার আসনে বসানো	এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।
বড় শিরক	কর্তৃত্বে শিরক	আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানব রচিত বা মনগড়া কোনো নীতি আদর্শ মতবাদ বা দর্শন মেনে নেওয়া।	খিলাফতের স্থলে গণতান্ত্রিক শাসন, শারীয়া'হ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার স্থলে স্যাকুলার সমাজ, মুসলিম জাতীয়তাবাদের স্থলে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, ইত্যাদি।	এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।
বড় শিরক	বৈশিষ্টে শিরক	আল্লাহর কোনো বৈশিষ্টে অন্যকে বিশেষিত করা	আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আ'লিমু-ল-গাইব মনে করা, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে হাজির নাযির (সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা) মনে করা, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে গাউছ মনে করা, ইত্যাদি	এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।
ছোট শিরক	কসম	আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা	যেমনঃ মায়ের কসম, বাবার কসম, ছেলের কসম, মেয়ের কসম, চন্দ্রের কসম, সূর্যের কসম, কাবার কসম, জীবনের কসম, মরণের কসম, ইত্যাদি।	মহাপাপ হয়
ছোট শিরক	রিয়া	মানুষের প্রশংসা পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য সৎকাজ করা	যেমনঃ বাবা, মা, স্বামী, উস্তাদ, পীর, নেতা ব্য অন্য কাউকে খুশী করার জন্য, অথবা মানুষের প্রশংসা কুড়াবার জন্য নেক কাজ করা, ইত্যাদি।	মহাপাপ ও ইবাদাতের ছাওয়াব নষ্ট
ছোট শিরক	তাবিজ কবজ	কোনো অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য তাবিজ কবজ ব্যবহার করা	আমাদের সমাজে অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য মাছের কাঁটা, গাছের জড়ি, কড়ি বা আজেবাজে তাবিজ ঝুলানোর রেওয়াজ রয়েছে। কুরআনের আয়াত বা সাহীহ সুন্নাহ থেকে পাওয়া কোনো দোয়া ব্যতীত অন্যকিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালে শিরক হয়।	মহাপাপ
কুফর	অস্বীকার করা	আল্লাহর দেয়া সুস্পষ্ট কোনো তথ্য বা বিধান মানতে অস্বীকার করা	যেমনঃ অনেকে বলে থাকেন.. জিন্ন-ভূত বলতে কিছুই নেই, অথচ কুরআনে জিন্নের কথা উল্লেখ আছে, বিজ্ঞান বলে আসমান বলতে কিছু নেই, ইত্যাদি।	ঈমান বিনষ্ট এবং আ'মাল বরবাদ
কুফর	অমান্য করা	আল্লাহর দেয়া কোনো বিধান অমান্য করা	সালাতের আবশ্যকতাকে অমান্য করে সালাতকে ঐচ্ছিক মনে করা, রমজানের রোজাকে ঐচ্ছিক মনে করা, হিজাব, সমাজনীতি বা ইসলামী বিচার ও শাসনবিধি অমান্য করা	ঈমান বিনষ্ট এবং আ'মাল বরবাদ
কুফর	অবজ্ঞা করা	আল্লাহর দেয়া কোনো বিধানকে অবজ্ঞা করা	কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট কোনো হারামকে অবজ্ঞা করা, ইসলামী বিচার, শাসন বা অন্য কোনো বিধানকে অবজ্ঞা করা, হিজাবের বিধানকে অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি	ঈমান বিনষ্ট এবং আ'মাল বরবাদ
কুফর	গোপন করা	আল্লাহর দেয়া কোনো কোনো বিধান বা তথ্য গোপন করা	জিহাদের বিধানকে গোপন করা, চার বিয়ের বিধানকে গোপন করা, হুদুদ সংক্রান্ত বিধি বিধানকে গোপন করা, ইত্যাদি	ঈমান বিনষ্ট এবং আ'মাল বরবাদ
কুফর	কিছু মানা আর কিছু না মানা	আল্লাহর বিধানের কিছু মানা আর কিছু না মানা ।	নামাযের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মানলেও রাজনীতির ব্যাপারে অন্যের বিধান, রোজার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মানলেও সমাজনীতির ব্যাপারে অন্য বিধান, ইত্যাদি	ঈমান বিনষ্ট এবং আ'মাল বরবাদ
কুফর	যাদু	শয়তানী শক্তি ব্যবহার করে কর্ম হাসিল করা	আমাদের সমাজে তাবিজের নামে যা দেওয়া হয় এর অধিকাংশই যাদু। সংখ্যার তাবিজ, নকশার তাবিজ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামের তাবিজ, ইত্যাদি	ঈমান বিনষ্ট এবং আ'মাল বরবাদ

আমাদের আহবানঃ আজকাল আমরা যে সমাজে বাস করছি এর মূলভিত্তি শিরক এবং মূলস্রোত কুফরের দিকে ধাবমান। বর্তমান বিশ্বে এমন কিছু মতবাদ, আদর্শ ও নীতিমালা তৈরি হয়েছে যা ঈমান বিধ্বংসী। এসব মতবাদ, আদর্শ ও নীতিমালা আমাদের সমাজ ও জীবনের সাথে একেবারে মিশে গেছে এবং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এসবের প্রভাবে আমাদের জীবনটা পরিনত হয়েছে ইসলাম ও কুফরের কানামাছি খেলায়। আমাদের জীবনটা যেন আজ সেই হাদীছেরই বাস্তব রূপ, যেখানে বলা হয়েছেঃ অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন মানুষ সকালে মুঅমিন হবে আর বিকালে কাফির, বিকালে মুঅমিন হবে আর সকালে কাফির। সলে আমরা এক নাজুক সময় অতিক্রম করছি। তাই আসুন! এসব ব্যাপারে সতর্ক হই, নিজের ঈমান ও আক্বীদাহ বাঁচাতে সচেষ্ট হই, বিষয়গুলো নিয়ে একটু ভাবি, চিন্তা করি এবং এব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করি। হে আল্লাহ! আমাদের তাওফিক দান কর। আমীন!!